গীতার সারাংসার

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১. গীতার জ্ঞেয়-তত্ত্ব	:	১
২. নিজের জানাকে গুরুত্ব দিন	:	৮
৩. ভয় এবং আশা ত্যাগ	:	১৩
৪. স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব	:	১৯
৫. বাসুদেবঃ সর্বম্	:	২৩
৬. অহংকার এবং তার নিবৃত্তি	:	২৭
৭. গীতার অলৌকিক শিক্ষা	:	৩৫
৮. যোগঃ কর্মসু কৌশলম্	:	৪২
৯. গীতার তাৎপর্য	:	৫১
১০. গীতার অনাসক্তি যোগ	:	৬৮

॥ শ্রীহরিঃ ॥

গীতার জ্ঞেয়-তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে জ্ঞেয় হচ্ছে একমাত্র পরমব্রহ্ম পরমাত্মা। আলোচনা করলে বোঝা যায় যে তাকেই জ্ঞেয় বলে যা জানা যায়, যা জানার যোগ্য অথবা যা জানা আবশ্যক। এই তিনটির মধ্যে যেটি প্রথম জ্ঞেয় অর্থাৎ যেটিকে প্রথমে জানা যেতে পারে সেটি হল সংসার। কেননা এই নশ্বর জগৎই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা অথবা অন্তঃকরণের দ্বারা জানা যায় এবং যে সাধনগুলির দ্বারা আমরা সংসারকে জানি সেই সাধনগুলিও বাস্তবে এই সংসারেরই অন্তর্গত। এই সংসারকে জানাও উপযোগী তবে সংসারকে জানার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে সেটির প্রতি আসক্তি ত্যাগের। অর্থাৎ এই সংসার জ্ঞেয় হয়েও (তা) ত্যাজ্য। বস্তুতপক্ষে পরমাত্মাই একমাত্র জ্ঞেয়। গীতা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে—

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ। (১৫।১৫)

বেদ্যং পবিত্রম্। (৯।১৭)

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানের কুড়িটি সাধনকে 'জ্ঞান' বলে জানিয়ে—সেই সাধনগুলির দ্বারা যার জ্ঞান হয় সেই জ্ঞেয়-তত্ত্ব হল পরমাত্মা—এই কথা স্পষ্ট করে বলেছেন—

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥

(গীতা ১৩।১২)

এই শ্লোকের প্রথম পাদে তিনি জ্ঞেয়-তত্ত্ব জানাবার প্রতিজ্ঞা করেছেন,

দ্বিতীয় পাদে তাকে জানার ফল অমৃত প্রাপ্তি বলেছেন, তৃতীয় পাদে লক্ষণসহ তার নাম জানিয়েছেন এবং চতুর্থ পাদে সেই জ্ঞেয়-তত্ত্বের এই অলৌকিক বর্ণনা করেছেন যে তাকে সৎ বা অ-সৎ কিছুই বলা যায় না।

এইভাবে এই শ্লোকে পরমাত্মার নির্গুণ-নিরাকার রূপের বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী শ্লোকে পরমাত্মার সগুণ-নিরাকার রূপের বর্ণনা করেছেন—

সর্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

(গীতা ১৩।১৩)

'সর্বত্র তাঁর হাত পা, সর্বত্র তাঁর চোখ, মাথা এবং মুখ আর সব জায়গাতেই তাঁর কান তথা সবাইকে ঘিরে তিনি স্থিত।' যেমন সোনার ঢেলাতে সব জায়গায় গহনা থাকে, যেমন রং-এ সব চিত্র অঙ্কিত হয়, কালির দ্বারা সব লিপি লিখিত হয়, বিদ্যুৎ এক হলেও তার দ্বারা নানা কার্য যন্ত্রের বিভিন্নতার দরুণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে—একই বিদ্যুৎ বরফ জমায়, হিটার জ্বালায়, লিফটকে ওঠা-নামা করায়, ট্রাম ও ট্রেন চালায়, শব্দকে প্রসারিত করে ও রেকর্ড করে, পাখা চালায়, আলো জ্বালে—এইভাবে তার দ্বারা অনেক পরস্পর বিরুদ্ধ ও আশ্চর্যজনক কাজ হতে দেখা যায়। এইভাবেই সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি অনেক পরস্পর বিরোধী এবং বিচিত্র কাজ-কর্ম পরমাত্মার দ্বারা হয়ে থাকে। কিন্তু পরমেশ্বর সেই একই। এই তত্ত্ব বুঝতে না পারার দরুণই লোকে বলে যে পরমাত্মা যখন এক তখন সংসারে কেউ সুখী ও কেউ দুঃখী কেন ? তারা জানে না যে, যে ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার তথা মন-বাণী ও বুদ্ধির অতীত, সেই ব্রহ্মই সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়কারী সগুণ-নিরাকার পরমেশ্বর। এঁর একত্ব প্রতিপন্ন করতেই গীতা বলেছে—

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥

(১৩।১৪)

'সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত হয়েও সকল ইন্দ্রিয়ের কাজ তিনি করেন এবং আসক্তিরহিত হয়েও সকলের ধারণ-পোষণ করেন। সম্পূর্ণ নির্গুণ হয়েও তিনি সকল গুণের ভোক্তা।'

তথা—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

(গীতা ১৩।১৫)

তিনি সকল প্রাণীর বাহিরে ও ভিতরে রয়েছেন এবং চর-অচর প্রাণী সবই তিনি। অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি অবিজ্ঞেয়, কেননা তিনি 'অণোরণীয়ান্'—অণুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর। জানা যেতে পারে এমন জড় পদার্থগুলি অপেক্ষা তাঁর জ্ঞান সূক্ষ্ম এবং জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞাতা আরও অধিক সূক্ষ্ম। তাহলে তাঁকে কেমন করে জানা যেতে পারে ? শ্রুতিতে বলা হয়েছে—

'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ?'

তাঁরই চিৎ-শক্তিতে বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়গুলি জানতে সমর্থ হয়। সেই জ্ঞেয় তত্ত্ব অতি দূরে আবার অতি নিকটেও অবস্থিত। দেশের (স্থানের) দৃষ্টিতে দেখলে পৃথিবীর চেয়ে নিকটবর্তী হল শরীর, শরীরের চেয়ে কাছে প্রাণ, প্রাণের চেয়ে কাছে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গুলির চেয়ে কাছে মন, মনের চেয়ে বুদ্ধি কাছে। বুদ্ধির চেয়ে জীবাত্মা এবং তার প্রেরক ও প্রকাশক হলেন সর্বব্যাপী পরমাত্মা। আবার দূরে দেখলে শরীরের চেয়ে দূরে পৃথিবী, পৃথিবীর চেয়ে দূরে জল, জলের চেয়ে তেজ দূরে, তেজ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে আকাশ, আকাশ থেকে দূরে সমষ্টি-মন, মন থেকে দূরে মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব থেকে দূরে পরমাত্মার প্রকৃতি তথা প্রকৃতি থেকে অতি দূরে স্বয়ং পরমাত্মা। অতএব দেশের দৃষ্টিতে পরমাত্মা দূরতম। এরূপে কালের দৃষ্টিতে পরমাত্মা দূরতম আবার নিকটতমও বটে। বর্তমান কালে তিনি তো পরমাত্মা, কেননা প্রত্যেকটি জড় বস্তু প্রত্যেক মুহূর্তে বিনাশ প্রাপ্ত

হয়, সেজন্য সেগুলির সত্তাই তো নেই। যদি সেগুলির সত্তাকে স্বীকার করাও হয় তাহলেও তার চেয়ে নিকটবর্তী সেই সত্য তত্ত্ব আর অতীতকালের দৃষ্টিতেও দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বর্ষ, যুগ, চতুর্যুগ, কল্প, পরার্ধ, ব্রহ্মার আয়ু এবং তাঁরও আগে—

'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।'

তিনি স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত-ভেদমুক্ত সত্যস্বরূপ। পরব্রহ্ম পরমাত্মাই ছিলেন আর ভবিষ্যতেও সেইভাবে ক্ষণ, পল, দণ্ড, ঘড়ী, প্রহর, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বর্ষ, যুগ, চতুর্যুগ, কল্প, পরার্ধ তথা ব্রহ্মার আয়ুর পরেও সেই পরমাত্মাই থাকবেন—**'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ।'** অতএব দূর থেকে দূরান্তে সেই তত্ত্বই বিদ্যমান।

যে জ্ঞানের অন্তর্গত দেশ-কাল-বস্তুর প্রতীতি হয় সেই চিৎস্বরূপ জ্ঞানই বিদ্যমান এবং তার অন্তরস্থ দেশ-কাল-সকল বস্তু মুহূর্তের জন্যও স্থির না থেকে কেবল পরিবর্তনশীল বলেই প্রতীত হয়। পরিবর্তনশীলতায় বস্তু না হয়ে কেবল ক্রিয়াই হয়ে থাকে আর সেই ক্রিয়াও কেবল প্রতীত হয়। বস্তুত সেখানে ক্রিয়াও টিকে থাকে না, কেবল জ্ঞানই থাকে। সেই জ্ঞান চিন্মাত্র, যেমনকার তেমনই বিদ্যমান থাকে। সেটি অবশ্যই জানার বিষয়—

যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।

সেটি জেনে নেবার পর জীব জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য, প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়ে গিয়ে কৃত-কৃত্য হয়ে যায় অর্থাৎ তার কিছুই জানার আর বাকি থাকে না, কিছু পাওয়াও বাকি থাকে না, কিছু করাও বাকি থাকে না। সেটিই জ্ঞেয়-তত্ত্ব—

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥

(গীতা ১৩।১৬)

বহু আকারে বিভক্ত প্রাণীদের মধ্যে অবিভক্ত, অর্থাৎ বিভাগরহিত একটি তত্ত্বই বিভক্তের মতো প্রতীত হয়। অনেক লোকের মধ্যে সত্তাস্ফূর্তি

প্রদানকারী একটি তত্ত্বই বিদ্যমান। তিনিই জগৎ সৃষ্টিকারী বলে ব্রহ্মা নামে কথিত হন, পালনকারী হওয়ায় বিষ্ণুরূপে এবং সংহারকারী হওয়ার কারণে মহাদেবরূপে বিরাজমান থাকেন।

'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ'—তিনি জ্যোতিপুঞ্জেরও জ্যোতিঃস্বরূপ। অর্থাৎ যেমন সূর্য হল জল-স্থল প্রভৃতি সমস্ত ভৌতিক পদার্থের প্রকাশক, এবং সেই সূর্যই জল-স্থল প্রভৃতি সব কিছুর ভাব ও অভাব দুটিই প্রকাশিত করে, যেমন সূর্যের প্রকাশ-অপ্রকাশকে নেত্র নির্বিকাররূপে প্রকাশিত করে, নেত্রের দেখার ক্রিয়া তথা নেত্রের ঠিক-বেঠিক অবস্থাকে একরূপে অবস্থিত মন প্রকাশিত করে, মনের শুদ্ধ-অশুদ্ধ অনেক বিকারযুক্ত ক্রিয়াকে বুদ্ধি নির্বিকাররূপে প্রকাশিত করে। আবার বুদ্ধির ঠিক-বেঠিক কাজকে আত্মা প্রকাশিত করে ; সেইরকম সমষ্টি-সৃষ্টি, তার নানান ক্রিয়া এবং অক্রিয় অবস্থাগুলিকে শুদ্ধ চেতনরূপ-পরমাত্মা প্রকাশিত করেন। অতএব তিনি জ্যোতিপুঞ্জের জ্যোতি তথা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি কেবল জ্ঞানরূপ। তিনিই জানার যোগ্য আর গীতার ১৩ অধ্যায়ের ৭ থেকে ১১ পর্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতি কুড়িটি সাধনার দ্বারা প্রাপ্তব্য। তিনি সকলের হৃদয়ে সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকেন। ভগবান স্পষ্ট করে বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। (গীতা ১৫।১৫)

তথা

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। (গীতা ১৮।৬১)

তিনিই সর্বব্যাপক, সর্বাধিষ্ঠান, সর্বরূপ পরমাত্মা, তিনিই সর্বতোরূপে জ্ঞাতব্য। তিনিই পরব্রহ্ম পরমাত্মা, সেখানে জগৎ তথা জগদাকাররূপে পরিণত হওয়ার প্রকৃতির অভাব বিদ্যমান সেখানে তিনি 'নির্গুণ-নিরাকার' বলে কথিত হন। সেই পরমাত্মাকে যখন প্রকৃতিসহ জগতের কারণরূপে দেখা হয় তখন তিনি সগুণ নিরাকাররূপে প্রতীত হন আর যখন তাঁকে আমরা সমগ্র জগৎ সংসারের স্রষ্টা, পালক এবং সংহারকরূপে দেখি তখন তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই ত্রিদেবরূপে জ্ঞাত হন। যখন ধর্মের

নাশ এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয় তখন সেই পরমাত্মাই সাধুদের রক্ষা ও দুষ্টের দমন করার জন্য, ধর্মের স্থাপনার জন্য রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতি বিবিধরূপে অবতার হয়েছেন এবং সাধুসন্তদের মতানুসারে তিনিই জ্যোতিরূপে সাধকদের দ্বারা অনুভূত হন। সাধুসন্তরা তাঁর বর্ণনা পতিরূপে এবং অমরলোকের অধিপতিরূপে করেছেন। আর একথাও বলেছেন যে 'তিনিই সংসারে ভক্তির প্রচার ও সংসারকে উদ্ধার করবার জন্য পরমহংসরূপ সন্তদের অমরলোক থেকে সংসারে প্রেরণ করেন।' তিনিই দিব্য বৈকুণ্ঠাধিপতি, দিব্যগোলকাধিপতি, দিব্যসাকেতাধিপতি, দিব্য কৈলাসাধিপতি, দিব্যধামের অধিপতি, সত্যলোকের অধিপতি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হন। আর এঁর প্রাপ্তিকেই পরমাত্মাপ্রাপ্তি, মোক্ষ-প্রাপ্তি, পরমস্থান প্রাপ্তি, পরমধাম প্রাপ্তি, আদ্যস্থানের প্রাপ্তি, পরম শান্তির প্রাপ্তি, অনাময় পদপ্রাপ্তি, নির্বাণ প্রভৃতি অনেক নামে গীতায় এবং অন্যান্য গ্রন্থে নিরূপণ করা হয়েছে। সর্বোপরি তিনিই পরমতত্ত্ব গীতার জ্ঞেয়-তত্ত্ব, তাঁর প্রাপ্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন—

যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

(গীতা ৬।২২)

যে স্থিতি প্রাপ্ত হবার পর মানুষ কখনোই বিচলিত হয় না। মানুষের বিচলিত হবার দুটি কারণ আছে—এক, যখন সে প্রাপ্ত বস্তুর চেয়ে বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা মনে স্থান দেয় তখন সে সেই স্থান থেকে সরে যেতে চায় ; দুই, যেখানে সে থাকে সেখানে যদি কষ্ট হয়, তার জীবনে কোনো ভয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহলেও সে সেই কার্যক্ষেত্র থেকে সরে যেতে ইচ্ছা করে। এই দুটি কারণের নিরাকরণ করে ভগবান বলেন যে ওই জ্ঞেয়-তত্ত্ব প্রাপ্তির চেয়ে বড় লাভ আর কিছু নেই। তাঁর দৃষ্টিতেও ওইটির চেয়ে বেশি লাভজনক আর কিছুই নেই। কেননা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো তত্ত্বই নেই। তাছাড়া তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষে সুখভোগের ভোক্তৃত্ব-ভাব থাকে না। তাই

ব্যক্তিত্বের অভাবে প্রচণ্ড দুঃখ এসে গেলেও কে বিচলিত হবে এবং কেমন করে হবে ? সেই মহাপুরুষ তো সর্বদা নির্বিকার হয়ে স্থিত থাকেন। তিনি গুণাতীত হয়ে যান।

ভগবান বলেন—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানযোস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

(গীতা ১৪।২২-২৫)

অর্থাৎ হে অর্জুন ! যে পুরুষ সত্ত্বগুণের কার্যরূপ প্রকাশে, রজোগুণের কার্যরূপ প্রবৃত্তিতে তথা তমোগুণের কার্যরূপ মোহতে প্রবৃত্ত হয়েও খারাপ বলে মনে করেন না আর তাতে নিবৃত্ত হয়ে তার আকাঙ্ক্ষা করেন না ; যাঁকে উদাসীন (সাক্ষী)-এর মতো স্থিত হয়ে থাকার জন্য বিচলিত করা যায় না এবং 'গুণই গুণেতে প্রবৃত্ত রয়েছে'—এটি জেনে নিয়ে যিনি সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় একীভাবে স্থিত থাকেন এবং সেই স্থিতি থেকে চলায়মান হন না ; যিনি নিরন্তর আত্মভাবে স্থিত হয়ে সুখ-দুঃখকে সমান মনে করেন এবং মাটি, পাথর ও সোনাকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন আর যিনি ধৈর্যশীল, প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান দেখেন, নিজের স্তুতি ও নিন্দায় সমান ভাববিশিষ্ট ; যিনি মান ও অপমানকে সমান মনে করেন, মিত্র ও শত্রুর প্রতি সমভাবাপন্ন—সকল কর্মের কর্তৃত্বের অভিমানমুক্ত সেই পুরুষ গুণাতীত বলে কথিত হন।

গীতার জ্ঞেয়-তত্ত্বের অনুভূতির এইটিই ফল।
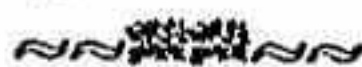
নিজের জানাকে গুরুত্ব দিন

এটি খুব ভালো কথা। দয়া করে সেদিকে মন দিন। যে কোনো পরিস্থিতিতেই মানুষ পড়ুক না কেন তাকে সর্বোত্তম মনে করে সেটিকে সদুপযোগ করলে মঙ্গল হবে। যত বস্তু পাওয়া গিয়েছে তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন নেই। আপনাদের কাছে যত বিদ্যা আছে তার চেয়ে বেশি জানার দরকার নেই। যত শক্তি আপনাদের কাছে আছে তার চেয়ে বেশি শক্তির প্রয়োজন নেই। আপনারা যত শক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা, পরিস্থিতি প্রভৃতি লাভ করেছেন সেগুলির উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারাই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করবেন। এটি সম্পূর্ণ সত্য এবং নিশ্চিত।

জানা বস্তু আপনাদের কাছে কিছু কম নেই। বরং আপনাদের সেই জানাকে আপনারা সঠিকভাবে ব্যবহার করেন না, সেটিকে গুরুত্ব দেন না—এইটিই হল ন্যূনতা। আমাদের এখন যে পরিস্থিতি সেইটিই চিরকাল ওইরকম থাকবে না—এই জ্ঞান আমাদের কাছে কম নেই, সম্পূর্ণই আছে। এই জ্ঞানকে যদি আপনারা সঠিকভাবে ব্যবহার করেন তাহলে এই জ্ঞানই আপনাদের উদ্ধারের পক্ষে যথেষ্ট, বিন্দুমাত্র কম নয়। এটির উপযুক্ত প্রয়োগ হল—আপনারা প্রাপ্ত পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়বেন না, তাতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট কিছুই হবেন না।

শ্রোতা—আমাদের এই জ্ঞান তো আছে, কিন্তু যেমনটা চাই তেমনটা নেই।

স্বামীজী—যে জ্ঞান আপনাদের আছে তার সদ্ব্যবহার কি আপনারা করেন ? যে বস্তুকে আপনারা বিনাশশীল (ক্ষণভঙ্গুর) মনে করেন তা পাওয়ার ইচ্ছা কি হয়, না হয় না ?

শ্রোতা—হয়।

স্বামীজী—তাহলে তাকে বিনাশশীল কোথায় মানলেন ? যদি সত্যিই তাকে বিনাশশীল মনে করতেন তাহলে সেগুলি পাওয়ার ইচ্ছা আপনাদের হত না। যা বিনাশশীল তাকে পেয়ে কী লাভ হবে ? যেমন, ধনবানের কাছে ধন থাকে, ধন না থাকলে তাকে ধনবান বলা হয় না ; তেমনি সংসারের কাছে কেবল বিনাশশীল বস্তুই আছে। যা বিনাশশীল তা আমাদের কি রাজা-উজির করে দেবে ?

আপনারা স্বয়ং নাশবান নন, বরং শরীরই হল বিনাশশীল। যেসব জিনিস আপনারা পেয়েছেন, সেগুলি সব নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা নিজেরা নষ্ট হবেন না। বস্তু আগে ছিল না, পরেও থাকবে না আর বর্তমানে তা প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আপনারা আগেও ছিলেন, পরেও থাকবেন। আপনাদের সত্তা চিরকালীন। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমরা ভবিষ্যতে থাকব এই জ্ঞান বর্তমানে কী করে হবে ? এর উত্তর হল, আপনারা খারাপ কাজ করতে ভয় পান এবং ভালো কাজ করতে রাজি হয়ে যান, কেন না আপনাদের ভাব এইটিই থাকে যে খারাপ কাজ করলে ভবিষ্যতে দুঃখ পাবেন এবং ভালো কাজ করলে সুখ পাবেন। এতে প্রমাণিত হয় যে আপনারা ভবিষ্যতে আপনাদের সত্তাকে মেনে নিয়েছেন। যদি আমাদের সত্তাকে ভবিষ্যতে না মানি তাহলে স্বর্গে কে যাবে ? নরকেই বা কে যাবে ? কার পুনর্জন্ম হবে ? কার মুক্তি হবে ? কল্যাণ হলে আপনাদের আনন্দ হবে, না জগতের হবে ? তাৎপর্য হল আপনারাই থাকবেন, শরীরাদি বস্তু থাকবে না।

আপনারা ভেবে দেখুন যে বিনাশশীলের দ্বারা অবিনাশী কী করে সুখ পেতে পারে ? বিনাশশীলের অর্থ হল তার কাছে কেবল নাশই আছে, নাশ ছাড়া আর কিছুই নেই।

অন্তহুঁ তোহি তজৈঁগে পামর তূ ন তজৈ অবহী তে।

যে জিনিস নষ্ট হয়ে যায় তাকে ব্যবহার করুন, কিন্তু তার উপর ভরসা করবেন না। আপনাদের প্রসন্ন করবে এই ভেবে তাকে নিজেদের আশ্রয় করবেন না। একটু মন দিন। যে জিনিস এখন আপনাদের কাছে নেই সেটি

পেলে আপনারা কী করে প্রসন্ন হবেন ? যে জিনিস এখন নেই, তা পরেও থাকবে না, বিযুক্তই থাকবে। অতএব তা আপনাদের কী করে সুখী করবে ? তা পাওয়া যাবে, কী যাবে না তার ঠিক নেই। আর পাওয়া গেলেও থাকবে না। কেননা যা বিনাশশীল, তার বিনাশ হবেই।

শরীর বিনাশশীল তা তো আপনারা জানেন কিন্তু মানেন না, অর্থাৎ জানা বিষয়ে গুরুত্ব দেন না। আপনারা যদি আপনাদের জ্ঞাত বিষয়গুলির উপর জোর দিতেন তাহলে আপনারা বিনাশশীল বস্তুগুলির উপর ভরসা করতেন না, সেগুলির জন্য আশা করতেন না, সেগুলি পেলে খুশি হতেন না, না পেলে দুঃখী হতেন না, সেগুলি থাকুক এই ইচ্ছা করতেন না, সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে এই চিন্তাও করতেন না। আমরা যখন কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি তখন তা না পেলে আমাদের দুঃখ হয়। কিন্তু এই দুঃখ হল মূর্খতার পরিচয়। এতে মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নেই। যে বস্তু, পদার্থ থাকবে না, তাকে রাখতে চান, এবং তা নষ্ট হলে দুঃখিত হন, এ মূর্খতা ছাড়া আর কী ? আমাদের উপর যদি কোনো আপদ-বিপদ, দুঃখ এসে যায় তবে আমরা ভাবি যে তা কেমন করে দূর হবে ! কিন্তু বাস্তবে তো দেখা যায় তা দূর হয়ে যাচ্ছে। অনুকূল হোক আর প্রতিকূলই হোক তা থাকার নয়। প্রাপ্ত বস্তুর বিচ্ছেদ হবেই।

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্॥

(বাল্মিকী রামায়ণ ২।১০৫।১৬)

'সকল সংগ্রহের অন্ত হল বিনাশ, লৌকিক উন্নতির অন্ত হল পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং জীবনের অন্ত মরণ।'

যার বিয়োগ হবে তার থেকে সুখ কেমন করে পাওয়া যাবে ? তার বিয়োগে আমরা কেন দুঃখী হব ? সুখও থাকার নয়, দুঃখও থাকার নয়। থাকবেন আপনারা। যা যাওয়া-আসা করে তাতে সুখী বা দুঃখী হওয়া তো মূর্খতাই।

যা কখনো নষ্ট হয় না এবং যা এখনও মজুত রয়েছে সেই পরমাত্মার প্রাপ্তিতেই চিরন্তন সুখ পাওয়া যাবে। সেই পরমাত্মাকে ছাড়া আপনারা যদি

মান, সম্মান, শ্রেষ্ঠতা, আরাম, টাকা-পয়সা, আত্মীয়, ধনসম্পদে সন্তোষ পেতে চান তাহলে আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে।

আমি সেই কথাই বলছি যা আপনাদের অভিজ্ঞতায় আছে। বিরাট পণ্ডিতই হোন আর নিরক্ষরই হোন—তাঁদের অভিজ্ঞতার কথাই আমি বলছি। আমি কোনো বর্ণ, আশ্রম, জাতি, সম্প্রদায়ের কথা বলছি না, প্রত্যুত আমি বলছি সকল মানুষের অভিজ্ঞতার কথা। যার সংযোগ হয় তার বিয়োগও হয়—বলুন, এটি কার কথা ? এটি কি হিন্দুর কথা, নাকি মুসলমান বা খ্রিস্টানের কথা ? বালকের, তরুণের, নাকি বৃদ্ধের কথা ? মহিলাদের, না পুরুষের ? সাধুদের কথা, না গৃহস্থদের ? এটি কার কথা ? এটি তো সকলেরই কথা। এই কথার উপর গুরুত্ব দিলে আপনারা বন্ধন-মুক্ত হবেন। গুরুত্ব দিতে হবে এই কথায় যে, যা আসে-চলে যায় এমন বস্তু, পরিস্থিতিতে আপনারা সুখী বা দুঃখী হবেন না !

যার বিচ্ছেদ হবে তার সাহায্য আপনারা কেন নেন ? আপনারা প্রথমে তার সাহায্য নিয়েছেন তারপর তার বিচ্ছেদে দুঃখী হয়েছেন, তবুও তার ওপর ভরসা করছেন এবং বার বার দুঃখ পাচ্ছেন। আপনারা যদি উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর প্রাপ্তিতে আনন্দিত ও ব্যথিত না হন তাহলে আপনারা অনুৎপন্ন পরমাত্মতত্ত্ব পেয়ে যাবেন। যার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, যার আদি এবং অন্ত আপনারা জানেন, তার আকাঙ্ক্ষা করা এবং তার প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হওয়া তো এক ঝঞ্ঝাট। এছাড়া অন্য কোনো ঝঞ্ঝাটই আপনাদের নেই। এই ঝঞ্ঝাটকে যদি আপনারা দূর করে দেন তাহলে আপনারা পরমাত্মতত্ত্ব পেয়ে যাবেন। সেই পরমাত্মতত্ত্ব কখনো বিনষ্ট (বিচ্ছেদ) হয় না। তা যেমনকার, তেমনই থেকে যায়, কেননা তা সৎ। সৎ-এর কখনো নাশ হয় না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)।

আপনাদের অপমান করলে আপনারা ব্যথিত হন, কিন্তু অপমান কি টিকে থাকে ? আপনাদের সম্মান দেখালে আপনারা সন্তুষ্ট হন, কিন্তু সম্মানও কি টিকে থাকে ? আপনারাই তো থেকে যান ; যে থাকে সে, যারা আসে-যায় তাদের কারণে সুখী এবং দুঃখিত হয় এ তো এক আশ্চর্য ! ভগবান গীতায়

সর্বপ্রথমে উপদেশ দিয়েছেন—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্॥

(গীতা ২।১২)

আমি, তুমি, এই রাজারা আগে ছিলেন না, এই কথাটি সত্য নয়, এবং পরেও থাকবেন না—এটিও সত্য নয়। এই কথা বলার তাৎপর্য কী ? তা হল, এখন যে পরিস্থিতি রয়েছে তা থাকবে না। যে বস্তু, পরিস্থিতি থাকবে না তা যদি এসে যায় তাহলে কী হল। আর যদি চলেও যায় তাতেই বা কী হল ? বিনাশশীলকে পেলে কেন প্রসন্ন হন ? সম্মান পেলেন তাতে হলটা কী ? সম্মান থেকে আপনি কী পেলেন ? কেবল প্রবঞ্চনাই পেলেন। প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই পাননি। জেনে শুনে আপনারা কেন প্রবঞ্চিত হন ? আপনাদের আজই এই চৈতন্য হোক যে এখন থেকে আমরা আর সম্মানে প্রসন্ন হব না এবং অপমানেও ব্যথিত হব না। কেননা সম্মানও থাকার নয়, এবং অসম্মানও থাকার নয়। সুখও থাকার নয়, দুঃখও থাকার নয়। এগুলি পেলেই বা কী হল আর না পেলেই বা কী হল ? যা বিনাশশীল তা পাওয়াও না-পাওয়া আর না পেলেও তো না পাওয়া। বাস্তবে যার নাশ হয় তার সঙ্গে সদাই বিচ্ছেদ, সংযোগ নেই-ই। সংযোগ হল আপনাদের কেবল ভ্রমবশত মেনে নেওয়া। যার সঙ্গে সদাই বিচ্ছেদ, যা আপনাদের সঙ্গে থাকবে না তাতে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হওয়ার কী কারণ ? কথাটি সত্যি, কি না ?

শ্রোতা—প্রকৃতই সত্য।

স্বামীজী—প্রকৃতই যদি সত্য হয়, তাহলে আজকেই, এখনই তা মেনে নিন। দেরি করার দরকার নেই। এর জন্য দু-এক মিনিটেরও ভবিষ্যৎ নেই। আসে-যায় এমন বস্তুগুলিতে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন যদি না হন তাহলে অবিনাশী বস্তু পেয়ে যাবেন, না পেলে আমার কানমুলে দেবেন।
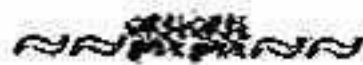
ভয় এবং আশা ত্যাগ

প্রশ্ন—সাধন, ভজন, সৎসঙ্গ সবই করি, তবু সংসার-প্রবাহের প্রভাব কেন পড়ে?

উত্তর—দেখুন ভাই! আমি একটি কথা বলছি, সেদিকে মন দিন। সংসারের প্রভাব কার উপরে পড়ে? গভীরভাবে চিন্তা করুন। সংসারের প্রভাব সংসারের উপরেই পড়ে, স্বরূপের উপর সংসারের প্রভাব পড়ে না। যখন কোনো ঘটনা ঘটে সেই মুহূর্তে তার যে প্রভাব পড়ে ক্রমে ক্রমে সেটি কমে গিয়ে এক সময়ে সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়। আপনাদের এই জ্ঞান আছে, কি নেই? এর উত্তর দিন।

প্রশ্ন—সৎসঙ্গ করার সময় তো এটি ঠিক মনে হয় কিন্তু পরে সেই ধারণা বদলে যায়।

উত্তর—পরে না থাকুক। সৎসঙ্গ যথার্থ বলে মনে হয়েছে তো? পরে থাকাটাও আপনি দেখতে চান, ভুল এখানেই। এইটি এখনই সংশোধন করে নিন। সংশোধন হল এই যে, এটি ব্যবহারে থাকে না অর্থাৎ অন্তঃকরণে থাকে না। ভাই! অন্তঃকরণে বৃত্তিগুলি তো ব্যবহার অনুসারেই হবে। যদি বৃত্তিগুলি সেরকম না হয় তাহলে ব্যবহার কেমন করে হবে? ভোজন কেমন করে হবে? কথা কী করে বলবেন, চলবেন কী করে? বলার কিছু না থাকলে কী করে কী হবে? ব্যবহার যেমন হবে বৃত্তিগুলিও সেরকম হবে! কিন্তু ব্যবহার এবং নির্জনতা এই দুটির জ্ঞান কি আপনাদের হয়? না, হয় না? যার দুটির জ্ঞান হয় তার জ্ঞানে ব্যবহার এবং নির্জনতা—উভয়েরই জ্ঞান থাকে। এই কথাটি বুঝে নিলে এখনই উদ্ধার লাভ করবেন।

ব্যবহার এবং ব্যবহাররহিত অক্রিয় অবস্থার কথা মনে করুন। অক্রিয় এবং সক্রিয়—এই দুটি অবস্থা। দুটিই প্রবৃত্তি। অক্রিয়ও প্রবৃত্তি এবং সক্রিয়ও

প্রবৃত্তি। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে সক্রিয় হল প্রবৃত্তি এবং অক্রিয় প্রবৃত্তি নয়। কিন্তু অক্রিয়ও প্রবৃত্তি এবং সক্রিয়ও প্রবৃত্তি। অক্রিয় এবং সক্রিয় যে আলোকে প্রকাশিত হয় সেই আলোকে প্রবৃত্তি নেই। সেই প্রকাশ একান্তে অবস্থান কালে পরিষ্কার দৃষ্ট হয়। আচরণ করা কালে তেমন দৃষ্ট হয় না। না দৃষ্ট হলেও আচরণে প্রবৃত্তির জ্ঞান কার হচ্ছে ? প্রবৃত্তিকেও তো জানা যায়। জানা যায় না ? উভয় অবস্থার প্রকাশক যে জ্ঞান সেটি সর্বদাই বিদ্যমান। এই জ্ঞানে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দুটিই থাকে না। খুবই সহজ সরল কথা এই যে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি যাতে প্রকাশিত হয় তাতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কিছুই নেই। না আছে প্রবৃত্তি, না নিবৃত্তি। বুঝতে পারলেন তো ? তাহলে এতেই দৃঢ় থাকুন। বৃত্তি যাতে একই প্রকারের থাকে—এই ধারণা পরিত্যাগ করুন। আমার কথায় এই আগ্রহ আপনি আজ ছেড়ে দিন। যতদিন এগুলিকে ধরে রাখবেন ততদিন আপনার সন্তোষ হবে না। এইগুলিকে আজই ছেড়ে দিন, এখনই। ব্যবহারে যেমনই থাক না কেন ! কেননা বাস্তবে যা চিরকাল থাকে তা হল প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুটিরই প্রকাশক (তত্ত্ব) । তাহলে নিবৃত্তিকে এত গুরুত্ব দেন কেন ? বাস্তবিক তো প্রকাশ। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুটিই অবাস্তব। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুটিই সাপেক্ষ। প্রবৃত্তির দৃষ্টিতে নিবৃত্তি এবং নিবৃত্তির দৃষ্টিতে প্রবৃত্তি থাকে। বাস্তবে যে প্রকাশ তাতে প্রবৃত্তি নেই, নিবৃত্তিও নেই। কথাটি কি ঠিক নয় ? এতেই আপনার অবস্থান। আমার কথা মেনে নিন আর এই যে ভ্রান্তি অর্থাৎ প্রবৃত্তি যতক্ষণ থাকে এবং মাঝে-মধ্যে যদি প্রভাব পড়ে তাহলে আমার স্থিতিগত অবস্থান ঠিক নেই—এই ভুল ধারণা দূর করুন।

এই কথায় মন দিন, কার দ্বারা ত্যক্ত হয় ? নিবৃত্তি এল তো প্রবৃত্তি গেল, নিবৃত্তি গেল, প্রবৃত্তি এল। কোথায় এল, কোথায় গেল বলুন তো ? প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অবিদ্যমানতা হল কিনা ? এগুলির অবিদ্যমানতা যদি হয় তবে কার 'দ্বারা'-র প্রয়োজন কী ? এই ধরণের আগ্রহ ত্যাগ করুন। কার দ্বারা হল ? তোমার নিজের দ্বারা। 'এই রকম বৃত্তি চিরদিন থাকুক' এমন আগ্রহ ছেড়ে দিন। এই ধারণা ত্যাগ করলে কোনো ক্ষতি হবে না। খুব সোজা কথা, এতে

কোনো সন্দেহ নেই। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি নিজে থেকেই প্রকাশিত হয়, আর তা হতে থাকুক। নিজস্ব কোনো প্রয়োজন তার নেই। সারা দুনিয়ায় প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি হয়, কি না ? জাগ্রত অবস্থায় কাজ করা হয়, ঘুমের মধ্যে কাজ করা হয় না। তাই নয় কি ? এতে আপনার কী তফাৎ হল ? পৃথিবীতে যে প্রবৃত্তি রয়েছে তাতে আপনার মধ্যে কি পার্থক্য কিছু হয় ? আপনার আলোকে যে স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ তাতে তো কোনো পার্থক্য হয় না ! তাহলে কেন এর জন্য চিন্তা করেন ? সংসারের এই যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি এইগুলিই আপনার শরীরের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি। দুটি একেবারে একই ধাতুর।

প্রশ্ন—সংসারের প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে যাই, সেইজন্য সন্তোষ হয় না।

উত্তর—এইখানেই তো ভুল করেন, সন্তোষ কেন হয় না ? তার কারণ, আপনারা মনে করেন যে অন্তঃকরণ নির্বিকার থাকে। এই ধারণা আপনারা আঁকড়ে রেখেছেন। অন্তঃকরণ নির্বিকার যেন থাকে, এই ধারণা ছেড়ে দিন। অন্তঃকরণের নির্বিকার থাকা উচিত, এই ধারণাও ছেড়ে দিন। এই কাজ যখন প্রকৃতির তখন অন্তঃকরণ কী করে নির্বিকার থাকবে ? এতে তো বিকার হবেই।

প্রশ্ন—মহারাজ ! একটি কথা বলছি, আপনি তো এগুলিকে ছেড়ে দিতে বলেন। কিন্তু একটা ভয় ভয় করে। ভাবনা হয় যে ছেড়ে দিলে আমার পতন হবে না তো ?

উত্তর—এই জন্যই তো আমি বার বার বলেছি যে আমার কথায় ছেড়ে দিন। কেন একথা বলেছি ? কেননা আপনাদের মধ্যে ভয় রয়েছে। আপনাদের ভয়ের দিকটিতেও আমি লক্ষ্য রেখেছি। আপনারা ভয়ভীত হচ্ছেন। এইজন্যই বলছি ভয় পাবেন না। যতক্ষণ এটি ধরে রেখেছেন ততক্ষণ বাস্তবিক স্থিতি হবে না। বাস্তবিক স্থিতিতে এই ধারণাই হল বাধক, আর কোনো বাধা নেই। প্রকাশেতে পতন হয় না। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দুটিতেই প্রকাশ সমান থাকে। প্রকাশে তফাৎটা কোথায় ? ওতে যদি তফাৎ কিছু না থাকে তাহলে তার কেমন করে পতন হবে ? আপনারা মনে করেন যে অন্তঃকরণে নির্বিকারতা এসে যায়। যদি আসে তাহলে—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥

(গীতা ১৪।২২)

এই কথা কেমন করে হয় ? প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ যদি বাস্তবিক হত অর্থাৎ যদি এগুলির যথার্থই সত্তা থাকত তাহলে '**ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি**' একথা কেন বলা হবে ?

প্রশ্ন—মহারাজ, এই কথা তো সেইসব মহাপুরুষদের যাঁরা ঈশ্বরলাভ করেছেন ?

উত্তর—আমরাই তো সেই মহাপুরুষ। সেই মহান পুরুষেরা ভিন্ন নন। আমরাই মহাপুরুষ। প্রকাশের নামই মহাপুরুষ। এতে ভয় পাবেন না। একেবারেই ভয় পাবেন না, এই যে সাধারণ প্রকাশ, এতে স্থিতিশীলকেই মহাপুরুষ বলা হয়। মহাপুরুষ বলতে পারেন, ব্রহ্মও বলতে পারেন। সেই সাধারণ প্রকাশে কী আর তফাৎ হয় ? ব্রহ্মও সেই অনন্য। ভয়কে ঝেড়ে ফেলে দিন আর এর ফলে আমার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য হবে, এমন আশা ত্যাগ করুন। এই দুটি ছেড়ে দিন, এই দুটিই আসল বাধা।

নিষিদ্ধ আচরণ করার ইচ্ছা জাগে। নিষিদ্ধ আচরণের ত্যাগ হয়ে যাবে। এটি শুনে কি ভয় হচ্ছে ? ছেড়ে দিতে যখন ভয় হচ্ছে তার মানে আপনারা নিষিদ্ধ আচরণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গুরুত্ব দেওয়ার পর ছাড়তে গেলে তা কি করে ছাড়া যাবে ? তাকে আপনারা গুরুত্ব দিয়েছেন। গুরুত্ব প্রদান করে সেটিকে যদি ত্যাগ করতে চান তবে সেটির ত্যাগ কীকরে সম্ভব ! অতএব সেটিকে উপেক্ষা করুন। করা এবং না-করা দুটি বিষয়। উপেক্ষা করা তৃতীয় বিষয়। ক্রিয়া করতে হলে বিধি স্থির করতে হবে, নিষিদ্ধ করার নেই। কিন্তু ভিতরে বিধি এবং নিষেধ দুটিতে উদাসীন থাকা। কেননা বিধি এবং নিষেধ দুটিই প্রকাশিত হয়ে কোনো একটি আলোকে। সেই আলোকের সম্বন্ধ না বিধির সঙ্গে থাকে, না নিষেধের সঙ্গে থাকে। বিধির সম্বন্ধ হল নিষেধের সঙ্গে। নিষেধকে নিবৃত্ত করার জন্য বিধি আছে। বিধি রাখার জন্য বিধি নেই। তাই বিধি-নিষেধ, ভয় এবং আশা, এই দুটিকে ছেড়ে দিন। কথাটি বুঝতে

পারলেন কি ? আমার কথা বোধগম্য হল কি না ? বিধি এবং নিষেধের মধ্যে বিধির প্রতি লোভ এবং নিষেধের সম্পর্কে ভয় আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভয় আর লোভ থাকবে ততক্ষণ স্বরূপে আপনাদের স্থিতি হবে না। তাই ভয় এবং লোভকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। এগুলি ছেড়ে যাবেই। একেবারেই চিন্তা করবেন না। ভয় আসে তো আসুক। লোভ হয়েছে তো হোক। আপনার ব্যক্তিগত স্থিতির প্রতি দৃষ্টি রেখে একথা বলছি, প্রত্যেকের জন্য বলছি না। প্রত্যেকে তো কথাটি বুঝবেন না, হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। আপনার উপর বিপরীত প্রভাব পড়বে না, কেননা আপনি বুঝতে পেরেছেন যে বিধি এবং নিষেধের মধ্যে কোন্‌টি করা উচিত, কোন্‌টি করা উচিত নয়। এই দুটি হয়, আবার চলেও যায়। আসে-যায় এবং যা আসে-যায় তার সম্পর্কে যে জ্ঞাতা তার ওপর এগুলির কোনো প্রভাব পড়ে না। নিষেধেও কিছু লাভ-ক্ষতি হয় না, বিধিতেও কোনো লাভ-ক্ষতি হয় না। নিষেধেও কিছু বিগড়ে যায় না, বিধিতেও কিছু বিগড়ে যায় না অর্থাৎ বিধি-নিষেধের ফলে স্বয়ং-এর কিছু আসে-যায় না তাহলে আপনাদের উপর তার প্রভাব কী করে পড়বে ?

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।।

(গীতা ১৪।২৩)

তিনি অর্থাৎ সেই আলোকে বা সত্তায় স্থিত ব্যক্তি বিচলিত হন না। অর্থ হল এই যে তিনি যেমনকার তেমনি থেকে যান। অতএব ভয় এবং আশা এই দুটি ত্যাগ করুন। সমগ্র সংসার ভয় এবং আশায় বদ্ধ। কোনো রকমেরই ভয় বা আশা যেন না হয়। যতটা চুপ করে থাকতে পারেন, তাই থাকুন এবং বলতে থাকুন হে প্রভু ! এগুলি আমাকে প্রভাবিত করছে ! বলতে পারেন, কিনা ? যতক্ষণ চুপ করে থাকতে পারেন তাই থাকুন, এই শরণাগতিতে এবং চুপ করে থাকার মধ্যে অনেক শক্তি আছে। এতে নির্বল বল লাভ করবে এবং কার্যও সিদ্ধ হবে। আপনার মধ্যে শক্তি আসবে এবং কার্যসিদ্ধ হয়ে যাবে। নির্বিকার থাকায় আপনার মধ্যে শক্তি আসবে এবং শরণ নিলে সিদ্ধ হবেন। চুপ থাকলে শক্তি আসে।

এটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় যে, কথা বলতে বলতে বলা বন্ধ হয়ে যায়, চুপচাপ থাকুন বলার শক্তি আসবে। নিষ্ক্রিয় থাকলে শক্তি নিজে থেকেই আসে এবং সক্রিয় হলে শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের জন্য কাজ করলে ক্লান্তি আসে। ঘুমালে ক্লান্তি চলে যায় এবং শক্তি আসে। নিষ্ক্রিয় হলে কাজের শক্তি আসে। এটিতো অভিজ্ঞতা। তাই না ? তাই নিষ্ক্রিয় থাকলে শক্তি আসবে। আর হে প্রভু ! তাঁকে আশ্রয় করুন। তাহলে কাজ সিদ্ধ হয়ে যাবে। এটি হল মোক্ষম উপায়। এতে যদি সন্দেহ থাকে তো বলুন। অতএব শরণ নিয়ে সন্দেহাতীত হয়ে যান। এইটিই হল আপনার প্রকৃত চিকিৎসা। এই স্থিতিতে চুপ করে থাকলে পরিশ্রম করতে হয় না। ক্রিয়া হলেও ঠিক, না হলেও ঠিক। এতে নিজস্ব কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের দিক থেকে যেন না ক্রিয়া করায় আগ্রহ থাকে এবং না ক্রিয়া না-করায় আগ্রহ থাকে। দুটিতেই উদাসীন থাকুন। ক্রিয়া যদি হয় তো হোক। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ যাঁকে বলা হয় তাঁর সিদ্ধি এই মুহূর্তেই সিদ্ধ হয়ে যায়।

স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব

বস্তু নির্মাণ করা হয়, নতুন তৈরি করা হয়। আবার কোনো বস্তুর অন্বেষণ করা হয় অর্থাৎ বস্তু যেমনকার তেমনই আছে, কেবল তার উপর দৃষ্টি ফেলা হয়। বস্তু নির্মাণ করতে তো সময় লাগে কিন্তু দৃষ্টি ফেলতে সময় লাগে না। বস্তু হারিয়ে গিয়েছিল, অথবা সেই বস্তু সম্পর্কে খেয়াল ছিল না, এখন খেয়াল করতে সেটি পাওয়া গিয়েছে—এটি নির্মাণ করা হল না। এই বিষয়টিতে আপনারা একটু মন দিন।

যেখানে নির্মাণ হয় সেখানে কারক থাকে। কারক সেইটি যা ক্রিয়ার জনক। যেখানে কিছু সৃষ্টি করা হয় সেখানেই ক্রিয়া হয়ে থাকে। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব স্বতই বর্তমান। ভগবান বলেছেন—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি না লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। 'এই পুরুষ শরীরে থেকেও কিছু করে না, লিপ্তও হয় না।' অহংকারে মোহিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট মানুষ নিজেকে কর্তা মনে করে—**'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)। এইজন্য সত্য কথাটি মেনে নিন যে আমি কিছুই করি না—**'নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'** (গীতা ৫।৮) এবং

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্ত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

(গীতা ১৮।১৭)

'যার অহং ভাব নেই এবং যার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে এই সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করেও মারে না এবং আবদ্ধও হয় না।'

যার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে নেই তাকেই ত্যাগ করা যায়। যার সঙ্গে অটল সম্পর্ক তাকে ত্যাগ করা যায় না। তাৎপর্য হল বাস্তবে কোনো সম্বন্ধ নেই, কেবল সম্বন্ধ মেনে নেওয়া হয়েছে—এই মান্যতাকেই ত্যাগ করতে হবে।

যেমন, সূর্য থেকে প্রকাশকে আলাদা করা যায় না, কেননা তা অভিন্ন। তেমনই স্বয়ং-এ যদি কর্তৃত্ব ভাব থাকে, তবে তা দূর করা যাবে না। কিন্তু স্বয়ং-এ কর্তৃত্ব নেই, অহং ভাব নেই—**'ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। অহং ভাব আরোপ করা হয়েছে, ভুলক্রমে মেনে নেওয়া হয়েছে, তাকে ত্যাগ করলে তত্ত্ব যেমনকার তেমন অনুভূত হবে। এই জন্য অর্জুন বলেছেন—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা'** (১৮।৭৩)। স্মৃতি প্রাপ্ত হয়েছে, স্মরণে এসে গিয়েছে। কোনো কথা মনে পড়ে যাওয়ায় পরিশ্রম কোথায় ? মনে করতেও হয় না, বরং স্বতই মনে পড়ে যায়—**'স্মৃতির্লব্ধা'**। আগে ভুলে গিয়েছিলেন, সেদিকে খেয়াল ছিল না। এখন মনে পড়ে গেল, খেয়াল হল। ভক্তিযোগে আমরা ভগবানের, এটি মনে পড়ে গেল। জ্ঞানযোগে আমার স্বরূপ নির্বিকার—এটি মনে পড়ে গেল। কর্মযোগে সংসার আমার বা আমার জন্য নয়, এটি মনে পড়ে গেল। মনে আসা করণ-সাপেক্ষ নয়, বরং করণ-নিরপেক্ষ। কেবল করণ-নিরপেক্ষই নয়, কর্তা-নিরপেক্ষ, কর্ম-নিরপেক্ষ, সম্প্রদান-নিরপেক্ষ, অপাদান-নিরপেক্ষ এবং অধিকরণ-নিরপেক্ষও। তাতে কোনো কারক প্রযুক্ত হয় না। কারণ তা ক্রিয়াসাধ্য বস্তু নয়, তা স্বতঃসিদ্ধ।

যেমন, এটি যে গঙ্গা নদী তা আমরা আগে জানতাম না। এখন তা জানলাম। এই জানায় পরিশ্রম কিছু হয়েছে কি ? যখন জানতাম না তখনও গঙ্গা বিদ্যমান ছিল আর এখন যখন জেনেছি তখনও তা বিদ্যমান আছে। গঙ্গা যেমনকার তেমনই আছে। কখনো কখনো গভীর ঘুম থেকে জাগার পর 'আমরা কোথায়' তার খেয়াল হয় না। তারপর খেয়াল হলে মনে পড়ে যে আমরা অমুক জায়গায় রয়েছি। এতে পরিশ্রম কোথায় হল ? কেবল সেদিকে খেয়াল ছিল না। তেমনই এটি স্মরণে আসুক যে আমরা পরমাত্মারই, আমরা কর্তা নই, আমরা হলাম অসঙ্গ—**'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক ৪।৩।১৫)। এই শরীর এবং সংসার আগে আমার ছিল না, পরে আমার থাকবে না, এখনও আমার নয়—দৃষ্টি যেন এই দিকে থাকে। এতে উদ্যোগটা

কোথায় ? পরিশ্রম কোথায় ? আমাদের এই যে আত্মীয়স্বজন, এঁরা কত দিন ধরে রয়েছেন এবং কত দিন থাকবেন ? আগে ছিলেন না, পরে থাকবেন না এবং এখনও না থাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এটি প্রত্যক্ষ। বক্তৃতা দিতে যখন শুরু করেছিলাম তখন যতটা বলার ছিল এখন আর তা নেই, এখন বক্তব্য কমে গিয়েছে। এইভাবে কমতে কমতে তা শেষ হয়ে যাবে। আগে বক্তৃতা হয়নি। পরে থাকবে না এবং বক্তৃতার সময়েও তা না থাকার দিকে যাচ্ছে। এমনই জন্মের আগে শরীর ছিল না, পরে থাকবে না এবং এখনও সর্বদা নাস্তির দিকে যাচ্ছে। বয়স যতটা হয়েছে শরীরও ততটা গত হয়েছে। অতএব সংসারের সম্বন্ধ প্রতি মুহূর্তে ছিন্ন হচ্ছে। সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ছিল, সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হবে এবং এখনও তা হচ্ছে।

শ্রোতা—মহারাজা ! পরমাত্মায় তো ক্রিয়া নেই, কিন্তু সাধনা তো করণ-সাপেক্ষ হওয়া উচিত ?

স্বামীজী—আপনারা যদি করণ-সাপেক্ষ সাধনা করেন তো তার জন্য নিষেধ করব না। সাধনা দুরকমের হয়। এক, আমরা যেখানে স্থিত রয়েছি সেখান থেকে ওপরে ওঠা। দুই, যেখানে আমরা পৌঁছাতে চাই তাতে প্রবেশ করা। উপরে উঠতে করণ-সাপেক্ষ থাকে কিন্তু প্রবেশের ক্ষেত্রে করণ-সাপেক্ষ থাকে না। যেমন, আমাদের যদি অন্য জায়গায় যেতে হয় তাহলে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে সেই জায়গায় যেতে হবে। কিন্তু যেখানে যেতে চাই সেখানে প্রবেশ করে গেলে কি আর চলতে হবে ? তেমনই যা বাস্তবিক তত্ত্ব তার দিকে প্রথম থেকেই যদি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন যে তা যেমনকার তেমনই। তাহলে এতে করণ-সাপেক্ষতা কোথায় ? কেবল ভুল দূর করতে হবে। যে ত্রুটি হয়েছে তা সংশোধন করতে হবে।

এটি এক অমোঘ নিয়ম যে ত্রুটিকে ত্রুটি হিসেবে বুঝতে পারলেই তা দূর হয়ে যায়। এটি ঠিক নয়, ভুল—এইটুকু জানলেই ভুল দূর হয়। এতে উদ্যোগ কোথায় ? আমি যেমন বলেছি, শরীর আগে ছিল না, পরে থাকবে না এবং এখনও যত দিন শরীর রয়েছে তত দিন ক্রমাগত আমাদের সঙ্গে শরীরের

সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে চলেছে। এর জন্য কী উদ্যোগ করবেন ? আগে ওই দিকে খেয়াল ছিল না। এই খেয়াল ছিল যে আমরা তো বেঁচে রয়েছি। এখন খেয়াল হল যে আমরা প্রতি মুহূর্তে মরে যাচ্ছি। তফাৎ কেবল জ্ঞানেতে। আসল কথাটি উপলব্ধ হল, এইটিই হল তফাৎ। এতে করণ-সাপেক্ষ সাধনার কী আছে ? শেখা করণ-সাপেক্ষ, কেননা কারো দ্বারা শিখতে হবে, বই পড়ে জানতে হবে, স্মরণে রাখতে হবে—এগুলি করণ-সাপেক্ষ। কিন্তু যা বস্তুস্থিতি তা করণ-সাপেক্ষ কীকরে হবে ? যা আছে কেবল সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে—'**সংকর সহজ সরূপ সম্হারা। লাগি সমাধি অখণ্ড অপারা॥**' (শ্রীরামচরিতমানস ১।৫৮।৪)।
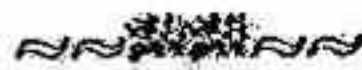
বাসুদেবঃ সর্বম্

গীতায় ভগবান একটি অসাধারণ কথা বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (৭।১৯)

'অনেক জন্মের পরে অর্থাৎ মনুষ্যজন্মে[১] সব কিছু বাসুদেব এই রকম যে জ্ঞানী আমার শরণ নেন সেই মহাত্মা খুবই দুর্লভ।'

জ্ঞান অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হয় না, বস্তুত যা বিদ্যমান তাকে যথার্থরূপে জেনে নেওয়ার নামই হল 'জ্ঞান'। 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (সব কিছুই পরমাত্মা) বাস্তবে এই জ্ঞানটি এই রকমই। এটি কোনো নতুন সৃষ্ট জ্ঞান নয়, এটি স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভগবানের কথা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে সব কিছুই পরমাত্মা। এটি কতই না আনন্দের কথা ! এটি খুবই মহান জ্ঞান। এর চেয়ে বড় আর কোনো জ্ঞান হতে পারে না। কেউ যদি সব শাস্ত্র পড়ে নেন, বেদ-পুরাণ পড়ে ফেলেন তাহলেও শেষ পর্যন্ত এই কথাটিই থাকবে যে সব কিছু পরমাত্মা। কারণ এই কথাটিই হল বাস্তব।

সংসারে প্রায়ই একথা কেউ জানান না যে তাঁর কাছে এত ধন-সম্পত্তি আছে, এত বিদ্যা আছে, এত কলাকৌশল আছে। কিন্তু ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মার হৃদয়ের গুপ্ত কথাটি সহজ কথায় আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে সব কিছুই পরমাত্মা। এর চেয়ে বড় কৃপা তাঁর আর কী হতে পারে ?

জগৎ সংসারকে যেমনই দেখা যাক না কেন—গাছ, পাহাড়, পাথর

---

[১]অনেক জন্মের পর হল এই মনুষ্য শরীর। এর পরে মানুষ যদি নতুন জন্মের প্রস্তুতি নেয় তাহলে নতুন জন্ম হবে, না হলে এর পর আর জন্ম হবে না। জন্ম হয় সংসারের প্রতি আসক্তির ফলে—'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু' (গীতা ১৩।২১)। আসক্তি না থাকলে জন্মগ্রহণ করার কোনো হেতু নেই।

রূপেই হোক, অথবা মানুষ, পশু, পাখি প্রভৃতি রূপেই হোক সকলের মধ্যে এক পরমাত্মা পরিপূর্ণ আছেন। পরমাত্মার স্থানে এই জগৎ দৃষ্ট হচ্ছে। বাইরে থেকে সংসারের যে রূপ দেখা যায় তা এক কায়া (খোলস)—এটি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল। কিন্তু এর ভিতরে সত্তারূপে এক পরমাত্মতত্ত্ব আছে যা অপরিবর্তনীয়, অবিনাশী। ভুল যেটি হয় তা হল বহিস্থ কায়ার দিকে আমাদের দৃষ্টি যায়। তার ভিতরে কী আছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি যায় না, এইজন্য ভগবান বলেছেন—**'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্'** (গীতা ১৮।৫৫) 'মানুষ আমাকে তত্ত্বের দ্বারা জেনে তৎক্ষণাৎ আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।' তত্ত্বের দ্বারা জানাটা কী ? যেমন সুতি কাপড়ে তুলোর সত্তা, মাটির বাসনে মাটির সত্তা, লোহার অস্ত্র-শস্ত্রে লোহার সত্তা, সোনার গহনায় সোনার সত্তা তেমনই সংসারে পরমাত্মার সত্তা—এইটি জানাই তত্ত্বের দ্বারা জানা, অর্থাৎ অনুভব করা।[১]

সোনার তৈরি গহনা অনেক রকমের হয়। কোনোটা গলায় পরার, কোনোটা হাতে পরার, কোনোটা কানের, কোনোটা নাকে পরার প্রভৃতি। সেই গহনাগুলির বিভিন্ন প্রকারের আকৃতি, বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন রকম ব্যবহার। ওজন বিভিন্ন রকমের, দাম আলাদা আলাদা। সেইগুলি বিভিন্ন রকমের, কিন্তু সোনা বিভিন্ন প্রকারের নয়। যার আকার অনেক নয়, এক তাকে জানাই হল তত্ত্বের দ্বারা জানা। অনুরূপভাবে জগৎ সংসারে মানুষ, পশু, পাখি, গাছ, পাহাড়, ইট, বালি, চুন, মাটি প্রভৃতি অনেক কিছু আছে, কিন্তু এগুলির ভিতরে যিনি থাকেন তাঁর কোনো প্রকার হয় না। সেই প্রকাররহিত তত্ত্বই হলেন পরমাত্মা।

যেমন গহনার পরিবর্তন হলেও সোনার পরিবর্তন হয় না। গহনা

---

[১]অলংকারে সত্তা হল সোনার, অলংকারের নয়। এইজন্য তৈরি করা অলংকারকে না বলে (স্থূল দৃষ্টিতে) সোনাকেই সত্য বলা হয়। বাস্তবে সোনারও কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মারই স্বতন্ত্র সত্তা আছে, সেই সত্য পরমাত্মার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই তুলা, মাটি, লোহা, সোনা প্রভৃতিকে সত্য বলা হয়েছে।

পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সোনা সেই একই থাকে। এইভাবে জগৎ সংসারে সব সময় পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে যে অপরিবর্তনশীল পরমাত্মতত্ত্ব আছে সেটি যেমনকার তেমনই থাকে। ভগবান বলেছেন—**'বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'** (গীতা ১৩।২৭) অর্থাৎ বিনাশশীলগুলির মধ্যে যে একটি অবিনাশী তত্ত্ব আছে, তাকে যে দেখে বাস্তবে সেই দেখে। যেমন, স্থূল দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে সব কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তুলা থাকে। বাসন সব নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু মাটি থাকে। অস্ত্র-শস্ত্র নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু লোহা থাকে। গহনা সব নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সোনা থাকে। এইরকমই সারা জগৎ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব নষ্ট হওয়ার নয়। যা কখনো বদলায় না, কখনো নষ্ট হয় না সেই তত্ত্বের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে, তাকেই স্বীকৃতি দিতে হবে, জানতে হবে, তাকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

আমরা যেমন বলে থাকি 'এটি হল পদার্থ'—অর্থাৎ এতে পদার্থ হল পরিবর্তনশীল সংসার এবং অপরিবর্তনীয় অপরিবর্তনশীল হলেন পরমাত্মতত্ত্ব। সংসারে তো দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতি অনেক কিছু আছে, কিন্তু সেইসব কিছুর মধ্যে 'অস্তি' (সত্তা) রূপে বিদ্যমান পরমাত্মতত্ত্ব একটিই। সাধকের দৃষ্টি সব সময় সেই 'অস্তি'র (পরমাত্মতত্ত্ব) দিকেই থাকা চাই।[১] সেই 'অস্তি'-ই হল পরিপূর্ণ এবং সকলের সদাসর্বদা প্রাপ্ত। সংসারকে কেউ কখনো প্রাপ্ত করেনি, তা প্রাপ্ত নয়, প্রাপ্ত হবে না এবং হতেও পারে না। আমরা এই ভুলটি করি যে আমরা সেই সংসারকে 'অস্তি' (প্রাপ্ত) বলে মেনে নিয়ে থাকি, যা বাস্তবে নেই। শরীর আগে ছিল না—একথা সকলেই জানেন। ভবিষ্যতে এটি থাকবে না, এটিও সকলের জানা এবং শরীর প্রতি মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এটিও সকলের অভিজ্ঞতালব্ধ। এই অভিজ্ঞতাকেই গুরুত্ব দিন।

---

[১]সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ (গীতা ১৩।২৭)

'বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে এরূপ সকল প্রাণীতে পরমাত্মাকে নাশরহিত এবং সমরূপে যিনি স্থিত দেখেন বাস্তবে তিনিই সত্যকার দেখেন।'

যদি ভক্তির দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে দেখবেন যে সমস্ত রূপের মধ্য দিয়ে এক পরমাত্মাই আমাদের সামনে আসেন। আমাদের ক্ষুধা পেলে তিনি অন্নরূপে আসেন, আমাদের তৃষ্ণা পেলে তিনি জলরূপে আসেন, আমরা অসুস্থ হলে তিনি ঔষধিরূপে আসেন, আমরা ভোগী হলে তিনি ভোগ্যরূপেই আসেন। আমাদের গরম লাগলে তিনি ছায়ারূপে আসেন, আমাদের ঠাণ্ডা লাগলে তিনি বস্ত্ররূপেই আসেন। তাৎপর্য হল সব রূপের মধ্য দিয়ে পরমাত্মাই আমাদের প্রাপ্ত হন। কিন্তু আমরা সেই রূপগুলির মধ্য দিয়ে আগত পরমাত্মাকে ভোগ করতে থাকি। তাতে পরমাত্মা দুঃখরূপে, নরকরূপে আসেন।

প্রশ্ন—পরমাত্মা অন্ন, জল, প্রভৃতি বিনাশশীল বস্তু রূপে কেন আসেন ?

উত্তর—আমরা নিজেদের শরীর বলে মান্য করে নিজেদের জন্য বস্তুগুলির প্রয়োজন স্বীকার করে নিই এবং সেগুলি চাই। সেজন্য পরমাত্মা সেই রূপ ধারণ করে আমাদের সামনে আসেন, আমরা অ-সতে স্থিত হয়ে দেখি বলে পরমাত্মাও অ-সৎরূপে দৃষ্ট হন। আমরা পরমাত্মাকে যেভাবে দেখতে চাই তিনি সেইভাবেই দৃষ্ট হন—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১) যেমন, শিশু খেলনা চাইলে মা পয়সা খরচ করেও তাকে খেলনা কিনে দেন। তেমনই আমরা যা চাই পরমদয়ালু পরমাত্মাও সেই রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আসেন। আমরা যদি ভোগ না চাই তাহলে ভগবান ভোগরূপে কেন আসতে যাবেন ? সাজানো রূপ কেন ধারণ করবেন ?
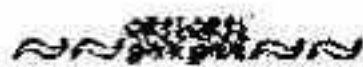
অহংকার এবং তার নিবৃত্তি

জীবের বন্ধনের মূল কারণ হল অহংকার। অহংকার দু প্রকারের—

(১) অপরা (জড়) প্রকৃতির ধাতুরূপ অহংকার (গীতা ৭।৪, ১৩।৫)। একে অহংবৃত্তিও (বৃত্তিরূপ সমষ্টিগত অহংকার) বলা হয়।

(২) চেতনের দ্বারা অপরা প্রকৃতির সঙ্গে স্বীকৃত সম্বন্ধের দ্বারা সৃষ্ট তাদাত্ম্যরূপ অহংকার। একে চিজ্জড়গ্রন্থিও (গ্রন্থিরূপ ব্যষ্টি অহংকার) বলা হয়।

ধাতুরূপ অহংকারে কোনো দোষ নেই। কেননা এই অহংকার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির মতো একটি করণমাত্র। এইজন্য সমস্ত দোষ তাদাত্ম্যরূপ অহংকারে অর্থাৎ দেহাভিমানেই আছে—**'দেহাভিমানিনি সর্বে দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি'**। জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞ ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষদের মধ্যে তাদাত্ম্যরূপ অহংকার সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যমান থাকে। তাই তার সম্পর্কে কথিত শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত সকল ক্রিয়া ধাতুরূপ অহংকারের দ্বারাই হয়ে থাকে।[১] কিন্তু জড় প্রকৃতির কার্যরূপ শরীরকে নিজের স্বরূপ মেনে নেওয়ায় মানুষ অজ্ঞানতাবশত নিজেকে ওইসব ক্রিয়ার কর্তা বলে মনে করে এবং বন্ধনে পড়ে যায়—**'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (৩।২৭)।

তাদাত্ম্যরূপ অহংকার ('আমি আছি') থেকে পরিচ্ছিন্নতা (একদেশীয়তা) আসে। পরিচ্ছিন্নতা আসা মাত্র এই অহংকারের অনেক প্রকারের ভেদ হয়ে যায়। বর্ণ, আশ্রম, শরীর, অবস্থা, যোগ্যতা, সম্বন্ধ,

---

[১]ধাতুরূপ অহংকারের দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিয়াগুলি গীতায় কয়েক প্রকারে বর্ণিত হয়েছে। যথা, সকল ক্রিয়া প্রকৃতির দ্বারাই হয়ে থাকে (১৩।২৯), প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (৩।২৭), গুণই গুণগুলিতে প্রবৃত্ত রয়েছে (৩।২৮, ১৪।২৩), গুণগুলি ছাড়া আর কোনো কর্তা নেই (১৪।১৯), ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয়ে অধিষ্ঠান করছে (৫।৯)।

পেশা, ধর্ম, উপাসনা প্রভৃতিকে নিয়ে অহংকারের হাজার হাজার প্রকার হয়ে থাকে। যেমন, বর্ণকে নিয়ে—'আমি হলাম ব্রাহ্মণ', 'আমি ক্ষত্রিয়' প্রভৃতি ; আশ্রমকে নিয়ে—'আমি হলাম ব্রহ্মচারী', 'আমি গৃহস্থ' প্রভৃতি ; শরীর নিয়ে—'আমি পুরুষ', 'আমি নারী', 'আমি মানুষ', 'আমি দেবতা' প্রভৃতি ; অবস্থাকে নিয়ে—'আমি বালক', 'আমি যুবক' প্রভৃতি ; যোগ্যতাকে নিয়ে—'আমি লেখাপড়া-জানা', 'আমি নিরক্ষর', 'আমি বোদ্ধা' প্রভৃতি ; সম্বন্ধকে নিয়ে—'আমি বাবা', 'আমি মা', 'আমি পুত্র' প্রভৃতি ; পেশাকে নিয়ে—'আমি অধ্যাপক', 'আমি ব্যবসায়ী' প্রভৃতি ; ধর্মকে নিয়ে—'আমি হিন্দু', 'আমি মুসলমান', 'আমি খ্রিস্টান' প্রভৃতি ; উপাসনাকে নিয়ে—'আমি নির্গুণ উপাসক', 'আমি সগুণ উপাসক', 'আমি রামের উপাসক', 'আমি কৃষ্ণের উপাসক' প্রভৃতি। এই সকল ভেদ কেবল অহংকে নিয়ে, তত্ত্বকে নিয়ে নয়। এইসবগুলিতে 'আমি' তো অনেক, কিন্তু 'হলাম' (সত্ত্বা) একটিই।[১]

সমগ্র সৃষ্টি ত্রিগুণাত্মক। শ্রীমদ্ভাগবতে অহংকারকেও তিন প্রকার বলা হয়েছে—সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। সুতরাং সৃষ্টিতে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের যত ভেদ দেখা যায় সবই অহংকারের। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যষ্টি-অহংকার থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাধকদের মধ্যে এবং তাঁদের সাধনাগুলির মধ্যে ভেদ থাকে। কিন্তু তত্ত্বের প্রাপ্তি হয়ে গেলে আর ভেদ থাকে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিকদের মধ্যে এবং দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নকারীদের মধ্যে সামান্যতম ব্যষ্টি-অহংকার থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দর্শনগুলির মধ্যেও

---

[১]প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই তাদাত্ম্যরূপ অহংকার থাকে। তাই পশু-পক্ষীদের মধ্যেও নিজ জাতির অহংকার থাকে। সেজন্য তারা নিজেদের জাতির মধ্যেই থাকে এবং নিজেদের জাতিতে সন্তানের জন্ম দেয়। তাদের এক একটি জাতির মধ্যেও পরস্পরের ভিন্ন ভিন্ন অহংকার থাকে। যেমন, কোনো পাড়ার কুকুর অন্য পাড়ায় গেলে সেখানকার কুকুর তাকে সেখানে ঢুকতে দেয় না, তার সঙ্গে ঝগড়া করে—'কুত্তা দেখ কুত্তা গুর্রায়া, মৈ বৈঠা ফির তূ ক্যোঁ আয়া?' (অর্থাৎ ভিন্ন পাড়ার কুকুরকে দেখে এ পাড়ার কুকুর তাড়া করে, আমার পাড়ায় তুমি কেন ঢুকলে) এইভাবে প্রাণীদের মধ্যে অহংএর ভেদ তো আছে, কিন্তু সত্তা ভেদ নেই।

ভেদ থাকে।[১] অহং-এর জন্যই দার্শনিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ এবং নিজের নিজের মতের প্রতি আগ্রহ (পক্ষপাত) থাকে। তার ফলে তাঁরা নিজেদের মতকে সমর্থন এবং অপরের মত খণ্ডন করেন। তাৎপর্য হল এই যে সূক্ষ্ম অহং (আংশিক ব্যক্তিত্ব) থাকলেই মতভেদ হয়, তত্ত্বে মতভেদ হয় না। অহম্ একেবারেই অবিদ্যমান হয়ে গেলে ভেদ থাকে না। তখন তত্ত্বই থাকে। তত্ত্বে অহং নেই এবং অহং-এ তত্ত্ব নেই। অহং-এ পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেখানে পার্থক্য থাকে সেখানে বোধ কোথায় এবং যেখানে বোধ সেখানে পার্থক্য কোথায় ?

'আমি আছি'-এতে 'আমি' জড় এবং 'আছি' চেতন। জড়ের প্রাধান্যে সংসারের ইচ্ছা এবং চেতনার প্রাধান্যে পরমাত্মার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য হল সংসারের ইচ্ছায় 'আমি'-র প্রাধান্য এবং পরমাত্মার ইচ্ছায় 'আছি'-এর প্রাধান্য থাকে। 'আমি' (জড়)-এর প্রাধান্য থাকলে জীব সংসারী হয় এবং 'আছি' (চেতন)-এর প্রাধান্য থাকলে জীব সাধক হয়। অতএব মুখ্যত তাদাত্মরূপ অহংকারের দুটি ভেদ—১। লৌকিক অহংকার, যথা, আমি সংসারী এবং ২। পারমার্থিক অহংকার, যথা, আমি সাধক।

লৌকিক অহংকার

অসৎকে ভোগ এবং সংগ্রহ করা যখন মানুষের উদ্দেশ্য হয় তখন 'আমি সংসারী' এই লৌকিক অহংকার তার হয়ে যায়। এটি দৃঢ় হয়ে গেলে মানুষ নিরন্তর সংসারী থাকে। সাংসারিক কাজকর্ম করার সময় তারা সংসারী তো

---

[১]ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, সাংখ্য, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা এই ছটি আস্তিক (ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী) দর্শন আছে। ন্যায় দর্শন এবং বৈশেষিক দর্শনে ভৌতিকতার প্রাধান্য আছে। যোগদর্শন এবং সাংখ্যদর্শনে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুটিরই বর্ণনা আছে। পূর্বমীমাংসায় স্বর্গাদি প্রাপ্তির এবং উত্তর মীমাংসায় (বেদান্তদর্শন) ব্রহ্ম প্রাপ্তি মুখ্য । এই দুটি দর্শনকে 'মীমাংসা' বলার তাৎপর্য হল এইগুলিতে চিন্তার (দর্শন অর্থাৎ অনুভূতি) প্রাধান্য নেই। সেখানে বৈদিক মন্ত্রগুলির চিন্তা প্রধান। এই দুটি বেদান্ত দর্শনেও কয়েকটি ভেদ আছে—অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রভৃতি।

থাকেই, সাধনা করার সময়েও তারা তাই থাকে। সেজন্য যে কোনো সাধনাই তারা করুক তা কামনাকে নিয়েই (কামনা পূর্তির জন্য) করে এবং সেই সাধনা তাদের মধ্যে সাধকভাবের অভিমান বৃদ্ধিকারক হয়ে যায়। অভিমান অহংকারেরই স্থূল রূপ।

যখন মানুষের মধ্যে ভোগের প্রবৃত্তি এবং সংগ্রহ করার আকাঙ্ক্ষা অধিক হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে স্বার্থ ও অভিমান এসে যায়। এগুলি হল আসুরী সম্পত্তি। স্বার্থ এবং অভিমান এসে গেলে তাদের অহংকার আসুরী সম্পদসম্পন্ন হয়ে যায়—**'অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ'** (গীতা ১৬।১৮), **'দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ'** (গীতা ১৭।৫)। আসুরী সম্পদসম্পন্ন অহংকার ভয়ংকর নরকগুলিতে নিয়ে যায়—**'পতন্তি নরকেঽশুচৌ'** (গীতা ১৬।১৬)।

যদি এই কথা মনে করা হয় যে জ্ঞান (মুক্তি) হলে আসুরী সম্পদসম্পন্ন অহংকারই দূর হয়ে যায়, তাদাত্ম্যরূপ অহংকার দূর হয় না—এই মান্যতা মোটেই ঠিক নয়। কারণ আসুরী সম্পদসম্পন্ন অহংকার দূর হয়ে গেলে নরক থেকে তো রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু মুক্তি হয় না। মুক্তি তাদাত্ম্যরূপ অহংকার দূর হলে তবেই হয়। আসুরী সম্পদসম্পন্ন অহংকার তো তাদাত্ম্যরূপ অহংকারেরই স্থূল রূপ, এটি প্রত্যেক জীবের মধ্যেই থাকে। এই তাদাত্ম্যরূপ অহংকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—**'অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি'** (গীতা ১৮।৫৮), **'যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে'** (গীতা ১৮।৫৯)।

অহংকারের উৎপত্তি অবিদ্যা থেকে হয়—**'অবিদ্যাস্মিতা-রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ। অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং .....'** (যোগদর্শন ২।৩-৪)। জ্ঞান হয়ে গেলে অবিদ্যা বিনষ্ট হয়। অবিদ্যাই যখন থাকবে না তখন অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন অহংকার কীকরে থাকবে ? যে জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূর হয় না সে আবার কেমন জ্ঞান ? তা হল শিখে নেওয়া জ্ঞান, অনুভূত জ্ঞান নয়। যদি তাদাত্ম্যরূপ অবিদ্যা দূর না হয় তাহলে বীজ থেকে যেমন বৃক্ষ জন্মায় তেমনই প্রাকৃত পদার্থ, ব্যক্তি, ক্রিয়া, পরিস্থিতি প্রভৃতির

সঙ্গ লাভ করে সে অহংকারও আসুরীসম্পন্ন হয়ে যায়।

গীতায় যেখানে জ্ঞান-সাধনার বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে ভগবান অহংকার থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন—**'অনহঙ্কার এব চ'** (গীতা ১৩।৮)। যখন সাধকদের মধ্য থেকেও এই অহংকার দূর হতে পারে তখন সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেলে এটি কীকরে থাকবে ? সিদ্ধ হয়ে যাবার পর তাদাত্মরূপ অহংকার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। ভগবান কর্মযোগে **'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ'** (গীতা ২।৭১) পদে, জ্ঞানযোগে **'অহঙ্কার ... বিমুচ্য নির্মমঃ'** (১৮।৫৩) পদে এবং ভক্তিযোগে **'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ'** (১২।১৩) পদে তাদাত্মরূপ অহংকারের নাশের কথা বলেছেন।

পারমার্থিক অহংকার

মানুষের উদ্দেশ্য যখন কেবল সৎ-তত্ত্ব প্রাপ্ত করাই হয় তখন তারা তার প্রাপ্তির জন্য 'আমরা হলাম সাধক'—এই পারমার্থিক অহংকারকে নিয়ে সাধনা করে। 'আমরা হলাম সাধক'—এই অহংকার মুক্তি দানকারী।[১] অহং-এ স্থিত কথা সব সময় থাকে। অতএব 'আমরা হলাম সাধক'—এই রকম অহংকার দূর হয়ে গেলে সাধকদের দ্বারা সাধনা নিরন্তর হয়ে থাকে। সাধনা করবার সময় তাঁরা তো সাধকই থাকেন, এমনকি সাংসারিক কাজ-কর্ম করাকালেও তাঁদের মধ্যে নিরন্তর 'আমি সাধক'—এই ভাব বজায় থাকে। সেজন্য তাঁরা যা কিছু সাংসারিক কাজকর্ম করেন সেগুলি সবই তাঁদের সাধনার অনুরূপ হয়ে থাকে। যেমন লোভী মানুষ এমন কাজ কখনোই করে না যার দ্বারা ধন নাশ হবে, তেমনই সেই সাধকেরা তাঁদের সাধনার বিরোধী কোনো কাজই করতে পারেন না।

সাধকের সাধনার সঙ্গে এবং সাধনার সাধ্যের সঙ্গে ঐক্য থাকে। সেইজন্য যতক্ষণ না সাধক সাধনায় তল্লীন হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সাধ্য (পরমাত্মতত্ত্ব)

---

[১]'অস অভিমান জাই জনি ভোরে। মৈঁ সেবক রঘুপতি পতি মোরে॥'

'দাসোঽহং কৌসলেন্দ্রস্য'—এটি হল পারমার্থিক অহংকার। বাস্তবে এটি অহংকার নয়, এটি হল ভগবানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাদাত্মরূপ অহংকার বিনাশ করে মুক্তিদানকারী।

প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য যতক্ষণ সাধকদের মধ্যে অহংকার থাকে ততক্ষণ তাঁরা সাধনায় তল্লীন হতে পারেন না। অহংকার দূর হলে সাধকরা সাধনায় তল্লীন হয়ে যান। অর্থাৎ সাধক থাকেন না, কেবল সাধনাই থেকে যায়। কেবল সাধনাই থাকলে সাধনা সাধ্যে পরিণত হয়ে যায় অর্থাৎ সাধ্য প্রাপ্ত হয়ে যায়।

সাধনাভেদে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটি ভেদও অহংকারের কারণে হয়ে থাকে। সাধক সাধনায় যেমন যেমন অগ্রসর হন অহংকারও সেইভাবে দূর হতে থাকে। আর অহংকারও যেমন যেমন দূর হয়ে যায় তেমনভাবে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের বিভেদও দূর হতে থাকে। অহংকার থাকলেও কর্মযোগে সাধনা করা যায়। কর্মযোগে সিদ্ধ হলে অবশ্য অহংকার দূর হয়ে যায়। জ্ঞানযোগে অহংকার ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যায়। ভক্তিযোগে অহংকার ভগবানে অর্পিত হয়। তাৎপর্য হল, কর্মযোগে অহং শুদ্ধ হয়, জ্ঞানযোগে অহং দূর হয় এবং ভক্তিযোগে অহং পরিবর্তিত হয়। অহং-এর শুদ্ধ হওয়া, দূর হওয়া এবং বদলে যাওয়া—এই তিনটিই পরিণামে এক হয়ে যায়।

কর্মযোগ হল ঐহিক সাধনা, জ্ঞানযোগ আধ্যাত্মিক সাধনা এবং ভক্তিযোগ আস্তিক সাধনা। ঐহিক সাধনায় 'অকর্ম'-এর প্রাধান্য থাকে, আধ্যাত্মিক সাধনায় 'আত্মা'-র প্রাধান্য থাকে এবং আস্তিক সাধনায় 'পরমাত্মার'-র প্রাধান্য থাকে। এইজন্য কর্মযোগী সকল কর্মে এক অকর্মকেই দেখেন—**'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ'** (গীতা ৪।১৮), জ্ঞানযোগী সকল প্রাণীর মধ্যে এক আত্মাকে দেখেন—**'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি'** (গীতা ৬।২৯) এবং ভক্তিযোগী সব কিছুতে এক পরমাত্মাকেই দেখেন অর্থাৎ অনুভব করেন—**'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি'** (গীতা ৬।৩০)। **অকর্ম, আত্মা এবং পরমাত্মা**—তত্ত্বগতভাবে তিনটিই এক। অতএব 'অকর্ম'-এ আত্মাও আছে এবং পরমাত্মাও আছেন, 'আত্মায়' অকর্ম আছে এবং পরমাত্মাও আছেন আর 'পরমাত্মায়' অকর্মও আছে, আত্মাও আছে। তাৎপর্য হল অহংকারের কারণেই অকর্ম, আত্মা এবং পরমাত্মা—এই তিনটি ভেদ হয়ে থাকে। তত্ত্বে এই তিনটি ভেদ নেই।

অকর্মকে অনুভব করলে কর্মযোগী কৃতকৃত্য হয়ে যান অর্থাৎ তাঁর কাছে আর করার কিছু বাকি থাকে না। আত্মাকে অনুভব করলে জ্ঞানযোগী জ্ঞাতজ্ঞাতব্য হয়ে যান অর্থাৎ তাঁর কাছে জানার আর কিছু বাকি থাকে না। পরমাত্মার অনুভব হলে ভক্তিযোগী প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হয়ে যান অর্থাৎ তাঁর কাছে পাওয়ার আর কিছু বাকি থাকে না।

কৃতকৃত্য হলে কর্মযোগী জ্ঞাতজ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যও হয়ে যান, জ্ঞাতজ্ঞাতব্য হলে জ্ঞানযোগী কৃতকৃত্য এবং প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যও হয়ে যান আর প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হলে ভক্তিযোগী কৃতকৃত্য এবং জ্ঞাতজ্ঞাতব্য হয়ে যান। কৃতকৃত্য, জ্ঞাতজ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হলে তাদাত্মজনিত অহংকার সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় এবং তত্ত্ব থেকে যায় অর্থাৎ অনুভূতিতে এসে যায়। তখন আর সাধকদের সাধনায় বিভেদ থাকে না। সাধক সাধন হয়ে সাধ্য লাভ করেন।

প্রশ্ন—আমাদের স্বরূপ অহং (আমিত্ব) থেকে মুক্ত—এটি কেমন করে অনুভব করব ?

উত্তর—শুধুই সত্তা অর্থাৎ স্ব-অস্তিত্বই হল আমাদের স্বরূপ। এই সত্তাটুকু ছাড়া আর সব কিছুই অবিদ্যমান। যা কিছু দেখা, শোনা এবং বোঝা যায়, যে করণগুলির (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি) দ্বারা দেখা, শোনা এবং বোঝা যায় সেগুলি এবং যা কিছু দেখা, শোনা ও বোঝা—এই সবই ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ এক মুহূর্তের জন্যও বিদ্যমানতা হয়নি, বিদ্যমানতা নেই, হবে না, হতে পারে না।

নিজস্ব যে স্বরূপ তাতে 'আমি' নেই আর যে 'আমি' আছে তাতে স্বরূপ নেই। যা কিছু বিকার সব আমিত্বতে আছে, স্বরূপে নেই। সত্তারূপ হওয়ায় স্বরূপ স্বতই নির্লিপ্ত। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্তা (স্বরূপ)-এর কখনো কোনো বিকার হয়নি, হয় না, হবে না, হতে পারে না। আমিত্বের স্বভাব হল সদা-সর্বদা বিকারগ্রস্ত থাকা এবং স্বরূপের স্বভাব হল নিত্য-নিরন্তর নির্বিকার থাকা। স্বতঃসিদ্ধ সত্তায় কর্তৃত্বও নেই, ভোক্তৃত্বও নেই—**'ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১),করে না, করায় না—**'নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্'** (গীতা ৫।৩৩)।

গীতায় ভগবান বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ (৭।৪)

'পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই আট প্রকারের ভেদবিশিষ্ট হল আমার অপরা প্রকৃতি।'

তাৎপর্য হল এই যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহং—এই সবগুলি একই জাতির (অপরা)। অতএব পৃথিবী যে জাতির, অহম্‌ও (আমিত্ব) সেই জাতির অর্থাৎ আমিত্বও মাটির ঢেলার মতো জড় এবং দৃশ্য। পদার্থকে যেমন দেখা যায় আমিত্বকেও তেমনই দেখা যায় অর্থাৎ আমিত্বও পদার্থগুলির মতো জানার যোগ্য। আমাদের স্বরূপ অহং থেকে ভিন্ন—এটি লক্ষ্য করাবার জন্য একটি কথা বলা হচ্ছে।

সুষুপ্তি (গভীর নিদ্রা) থেকে উঠে আমরা বলি যে আমরা এমন ঘুমিয়েছিলাম যে কোনো জ্ঞানই ছিল না। জ্ঞান এইজন্যই ছিল না যে তখন অহং ছিল না অর্থাৎ অহং অবিদ্যায় লীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা তো সেই সময় ছিলাম। যদি আমরা না থাকতাম তাহলে 'কোনো জ্ঞানই ছিল না'—এই জ্ঞানটাই বা কার হত ! জেগে ওঠার পর কে বলত যে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না, সুষুপ্তি অবস্থা বর্ণনার জন্য যে অহংভাব সেটি তখন ছিল না, কিন্তু আমরা অবশ্যই ছিলাম। যেমন, কোনো বাড়িতে একটি লোক আছে। বাইরে থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করছে, অমুক লোক কি বাড়িতে আছে ? সে বাড়ির ভিতর থেকে উত্তর দিল যে লোকটি বাড়িতে নেই। 'বাড়িতে নেই' একথা যে বলছে সেও কি বাড়িতে নেই। বাড়িতে যদি কেউ নাই থাকত তাহলে কে বলত যে, সে বাড়িতে নেই ? যে বলছে সে তো রয়েছে। এই ভাবে সুষুপ্তিতে 'আমার কিছুই মনে নেই'—এই কথা যে জানে সে তো ছিল। তাৎপর্য হল, সুষুপ্তিতে আমিত্ব থাকে না, কিন্তু আমাদের স্বরূপ থাকে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে আমিত্ব-রহিত নিজ সত্তা প্রকাশিত হয়।

আমরা আমিত্বের ভাব এবং অ-ভাব দুটিকেই জানি। আমিত্বের অ-ভাব হয়ে যায় কিন্তু আমাদের অ-ভাব হয় না। সমগ্র সংসারের নাস্তি হয়ে গেলেও আমাদের সত্তা থেকে যায়। অতএব সত্তা (অস্তিত্ব) হল আমাদের স্বরূপ। আমিত্ব আমাদের স্বরূপ নয়।

গীতার অলৌকিক শিক্ষা

প্রাণীমাত্রেরই পরম সুহৃদ ভগবানের মুখনিঃসৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রত্যেকটি মানুষের কল্যাণের জন্য আচরণের ক্ষেত্রে পরমার্থের অলৌকিক শিক্ষা দেয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ—তাঁরা যে কোনো বর্ণের, আশ্রমের, সম্প্রদায়ের, দেশের, পরিধানের এবং পরিস্থিতির হোন বা কেন তাঁরা নিজেদের অবস্থাতে থেকেও পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করতে পারেন। তাঁরা যদি নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করেন এবং নিষ্কামভাবে নিহিত কর্ম করতে থাকেন তাহলে তাঁরা তার দ্বারাই পরমাত্মতত্ত্ব পেয়ে যাবেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ (২।৩৮)

'জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। এইভাবে যুদ্ধ করলে তোমার পাপ (বন্ধন) হবে না।'

যুদ্ধের চেয়ে বড় ঘোর পরিস্থিতি আর কী হতে পারে ? যখন যুদ্ধের মতন ঘোর পরিস্থিতিতে মানুষ তার কল্যাণ করতে পারে তখন এমন কী পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে মানুষ তার কল্যাণ করতে পারবে না ?

সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি প্রভৃতি সব আসে আবার চলে যায়। কিন্তু আমরা যেমনকার তেমনই থাকি। অতএব সমভাবে আমাদের স্থিতি স্বতঃস্বাভাবিক। গীতা সেই সমতার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করায়—ওইগুলির মধ্যে যেও না, ওইগুলিতে প্রসন্ন-অপ্রসন্ন হয়ো না, বরং ওইগুলির সদ্ব্যবহার করো। যদি অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে অপরের সুখ বিধান করো, তাদের সেবা করো, আর যদি প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করো। গীতা খুবই অলৌকিক শিক্ষা দেয়—

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ (৩।১১)

'একে অপরকে উন্নত করায় রত থাকলে তোমরা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।'

প্রত্যেকেই একে অপরের অভাব পূর্ণ করবে, একে অপরের সুখবিধান করবে। একে অপরের হিতসাধন করবে তাহলে অনায়াসেই সকলের কল্যাণ হয়ে যাবে—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ১২।৪)। এইজন্য অপরের হিত সাধন করা উচিত, অপরের সুখ বিধান, অপরকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। অপরের কথা মান্য করা, তাদের সেবা করা, তাদের আরাম দেওয়া উচিত। অপরে আমাদের সেবা করুক বা নাই করুক তার পরোয়া করা উচিত নয়। অর্থাৎ অপরের কী কর্তব্য তা আমাদের দেখা উচিত নয়। বরং আমাদের উচিত নিষ্কামভাবে আমাদের কর্তব্য পালন করা, কেননা অপরের কর্তব্য দেখা আমাদের কর্তব্য নয়। এখানে একটি বিশেষ কথা মনে রাখা দরকার। তা হল এই যে আমাদের প্রাপ্য বস্তু পরিস্থিতি প্রভৃতি অন্য ব্যক্তির অধীন নয়, তা হল ভাগ্যের অধীন। ভাগ্যানুসারে যেমন প্রতিকুল বস্তু, পরিস্থিতি নিজে নিজেই এসে যায় তেমনই অনুকূল পরিস্থিতিও নিজে নিজে এসে যাবে। অন্য লোকেও তাদের ভাগ্যে যা আছে তাই পাবে। কিন্তু আমাদের সেদিকে না তাকিয়ে নিজেদের কর্তব্যের প্রতিই দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ আমাদের নিজেদের কর্তব্য পালন (সেবা) করতে হবে। দ্বিতীয় কথা, আমাদের সেবার বদলে যদি অপরেও আমাদের সেবা করে তাহলে আমাদের সেবার মূল্য কমে যাবে। যেমন, আমরা একজনকে দশ টাকা দিলাম আর সে আমাদের পাঁচ টাকা ফেরত দিল। তাহলে আমরা যা দিয়েছি তার অর্ধেকই বাকি রইল। অতএব পরিবর্তে কেউ যদি আমাদের সেবা না করে তাহলে আমাদের মঙ্গল খুব তাড়াতাড়ি হবে। যদি অপরে আমাদের সেবা করে অথবা যদি অপরের কাছ থেকে আমাদের সেবা নিতে হয় তাহলে তার উপকার মেনে নিন, কিন্তু তাতে প্রসন্ন হবেন না। প্রসন্ন হওয়া হল ভোগ আর ভোগ হল

দুঃখের কারণ—**‘যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে’** (৫।২২)।

‘আমার সুখ হোক, সম্মান হোক, আমার কথা থাকুক, আমি আরাম পাই, অপরে আমার সেবা করুক—এই ভাব হল পতনের কারণ।’ অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘মানুষ না চাইলেও পাপ করে কেন ?’ ভগবান বলেছিলেন, ‘আমি পাব’ এই কামনাই পাপে প্রবৃত্ত করে (৩।৩৬-৩৭)। যেখানে ব্যক্তিগত সুখের কামনা সেখানেই সব পাপ, সন্তাপ, দুঃখ, অনর্থ প্রভৃতি এসে যায়। এইজন্য নিজের সামর্থ্যানুসারে সকলের সুখ-বিধান, সকলের সেবা করা উচিত। কিন্তু তার বদলে কিছু চাওয়া উচিত নয়। আমাদের কাছে নিজস্ব বলে যে বল, বুদ্ধি, যোগ্যতা প্রভৃতি আছে তাকে নিষ্কামভাবে অপরের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে।

আমাদের কাছে কোনো বস্তু থাকলে সেই বস্তু না থাকার জন্য অপরকে কেন দুঃখ ভোগ করতে হবে ? আমাদের কাছে অন্ন-বস্ত্র-জল থাকা সত্ত্বেও অপরে কেন ক্ষুধার্ত, নগ্ন এবং তৃষ্ণার্ত থাকবে ? এই রকম মনোভাব থাকলে সকলেই সুখী হয়ে যাবে ? একে অপরের অভাব পূরণ করার রীতি ভারতবর্ষে স্বাভাবিক ছিল। কৃষক শস্য উৎপন্ন করত এবং সেই অন্ন দিয়ে জীবন নির্বাহের সকল সামগ্রী সে নিয়ে আসত। তরিতরকারি, তেল, ঘি, বাসন, কাপড় প্রভৃতি যা কিছু তার প্রয়োজন তা সবই শস্যের বদলে পাওয়া যেত। যে তরিতরকারি সে উৎপন্ন করত তা দিয়ে অন্য সামগ্রী নিয়ে আসত। এইভাবে লোকে কোনো একটি জিনিস তৈরি করত এবং তার দ্বারা অন্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে নিত। টাকা-পয়সার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন টাকা-পয়সা পাওয়ায় স্বভাব বদলে গিয়েছে। টাকা-পয়সার লোভের দ্বারা আমরা নিজেদের বিরাট পতন ঘটিয়েছি। পয়সা সংগ্রহের প্রবল ইচ্ছা জেগেছে, জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া কঠিন হয়ে গিয়েছে। তার কারণ জিনিসপত্র

বিক্রি করে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করেছি। এদিকে খেয়ালই নেই যে টাকা-পয়সা জমা থেকে স্বয়ং কোন কাজে আসবে ? কিন্তু অন্তঃকরণে টাকা-পয়সার গুরুত্ব থাকায় এই কথাটি সহজে বোঝা যায় না। অর্থের এই ক্ষুধা ভারতবর্ষের জীবনগত নয়, এটি কুসঙ্গজনিত।

একটি মর্মের কথা হল এই যে, অপরের যা অধিকার সেইটিই আমাদের কর্তব্য। যেমন, অপরের হিতসাধন আমাদের কর্তব্য এবং অপরের তা অধিকার। মা-বাবার সেবা করা, তাদের দেখা-শোনা করা পুত্রের কর্তব্য আর সেটি মাতা-পিতার অধিকার। তেমনই পুত্রের পালনপোষণ করা, তাদের শ্রেষ্ঠ, যোগ্যরূপে গড়া মা-বাবার কর্তব্য এবং পুত্রের সেটি অধিকার। গুরুকে সেবা করা, তাঁর আজ্ঞা পালন করা শিষ্যের কর্তব্য এবং সেটি গুরুর অধিকার। তেমনই শিষ্যের জ্ঞানান্ধকার দূর করা, তার মধ্যে পরমাত্মার অনুভূতি জাগ্রত করা গুরুর কর্তব্য এবং শিষ্যের অধিকার। অতএব মানুষকে নিজের কর্তব্য পালনের দ্বারা অপরের অধিকারকে রক্ষা করতে হবে। যেসব মানুষ অপরের কর্তব্য এবং নিজেদের অধিকার দেখে তারা কর্তব্যচ্যুত হয়ে যায়। তাই লোকেদের নিজেদের ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করতে হবে এবং অপরের ন্যায্য অধিকারকে রক্ষা করবার যথাসাধ্য কর্তব্য পালন করতে হবে। অপরের কর্তব্য এবং নিজেদের অধিকার দেখা ইহলোকে এবং পরলোকে পতনের কারণ। বর্তমানে যে অশান্তি, কলহ, সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায় তার প্রধান কারণ হল লোকেরা কেবল অধিকার দাবি করে, কিন্তু নিজেদের কর্তব্য পালন করে না। তাই গীতা বলেছেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন॥ (২।৪৭)

'নিজের কর্তব্য পালনেই তোমার অধিকার, তার ফলে নয়।'

পৃথিবীতে যেসব মানুষ নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন সেইসব আচার্য, গুরু, অধ্যাপক, বক্তা, মহন্ত, শাসক প্রভৃতির উপর অন্যদের শিক্ষা দেবার, তাদের কল্যাণ করার বিশেষ দায়িত্ব থাকে। তাই গীতা তাঁদের জন্য বলেছেন—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ (৩।২১)

'শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যেমন যেমন আচরণ করেন অন্য মানুষেরাও সেই রকম আচরণই করে থাকেন এবং তাঁরা যা বলেন অন্য মানুষেরা সেই রকমই করে থাকেন।'

উপরোক্ত শ্লোকে শ্রেষ্ঠ মানুষদের আচরণ সম্পর্কে 'যৎ যৎ', 'তৎ তৎ' এবং 'এব'—এ পাঁচটি পদ রয়েছে কিন্তু প্রমাণ (বচন)-এর সম্পর্কে 'যৎ' এবং 'তৎ' এই দুটি পদই আছে। এর তাৎপর্য হল অন্যের উপর মানুষের আচরণের প্রভাব পাঁচ গুণ (বেশি) হয়, আর বচনের প্রভাব দু গুণ (অপেক্ষাকৃত কম) হয়। যে মানুষটি নিজে কর্তব্য পালন না করে কেবল নিজের কথার দ্বারা অন্যকে কর্তব্য পালনের শিক্ষা দেয়, লোকেদের উপর তার শিক্ষার বিশেষ প্রভাব পড়ে না। লোকেদের উপর শিক্ষার বিশেষ প্রভাব তখনই পড়ে যখন শিক্ষাদাতা নিজেও নিষ্কামভাবে শাস্ত্র ও লোকমর্যাদা অনুসারে আচরণ করেন। তাই ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে যদিও তাঁর কাছে ত্রিলোকে কোনো জ্ঞাতব্য ও প্রাপ্তব্য নেই তবুও তিনি যখন যেখানে যেরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন তখন সেখানে সেই অবতার রূপেই তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। 'যদি আমি অনলস হয়ে সাবধানতার সঙ্গে কর্তব্য পালন না করি তাহলে আমার প্রতি যারা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পোষণ করে তারা সেইমতোই আচরণ করবে অর্থাৎ তারাও প্রমাদবশত অসাবধান হয়ে নিজেদের কর্তব্য উপেক্ষা করতে থাকবে। তার পরিণামে তাদের পতন হবে (৩।২২-২৩)।'

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনটি ন্যূনতা আছে—করবার ন্যূনতা, জানার ন্যূনতা এবং পাবার ন্যূনতা। এই তিনটি ন্যূনতা দূর করে নিজেদের উদ্ধার করার জন্য মানুষ তিনটি শক্তিও লাভ করেছে—করার শক্তি, জানার শক্তি এবং মানার শক্তি। এই তিনটি শক্তি থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেবল অবুঝ এবং সুখাসক্তির কারণে নিজেদের ন্যূনতাজনিত দুঃখ ভোগ করে। মানুষ যদি

এই তিনটি শক্তির সদ্ব্যবহার করে তাহলে নিজেদের ন্যূনতাগুলিকে দূর করে, পূর্ণতা লাভ করতে পারে, নিজেদের মনুষ্য জন্ম সার্থক করতে পারে।[১] নিষ্কামভাবে অপরের কল্যাণ সাধনের (সেবার) কর্ম হল 'করার শক্তির সদ্ব্যবহার, এ হল 'কর্মযোগ'। শরীরের সঙ্গে অসঙ্গ হয়ে স্বরূপে স্থিত থাকা হল 'জানার শক্তি'র সদ্ব্যবহার, এ হল 'জ্ঞানযোগ'। ভগবানকে নিজের এবং নিজেকে ভগবানের মান্য করা হল 'মানার শক্তি'র সদ্ব্যবহার। এ হল 'ভক্তিযোগ'। গীতা এই তিনটি যোগমার্গেরই শিক্ষা দেয়, যেমন—

যিনি কেবল যজ্ঞের জন্য অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য কর্ম করেন সেই কর্মযোগী কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান— '**যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে**' (৪।২৩)। তার কারণ শরীরাদি বস্তুসমূহকে নিজের এবং নিজের জন্য না মেনে অপরের সেবায় নিয়োজিত করলে এই বস্তুগুলির সঙ্গে স্বতই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

যিনি সমস্ত ক্রিয়াকে প্রকৃতির দ্বারা কৃত দেখেন এবং নিজেকে কোনো ক্রিয়ার কর্তা মনে করেন না সেই জ্ঞানযোগীর নিজের স্বরূপের বোধ হয়ে যায়।[২]

যিনি সংসারের প্রতি বিমুখ হয়ে কেবল ভগবানেরই শরণাগত হন এবং

---

[১]একটি বিশেষ কথা হল এই যে, করবার ন্যূনতা দূর হলে জানার এবং পাওয়ার ন্যূনতাও দূর হয়ে যায়। জানার ন্যূনতা দূর হলে করার এবং পাওয়ার ন্যূনতাও দূর হয় আর পাওয়ার ন্যূনতা দূর হয়ে গেলে করার এবং জানার ন্যূনতাও দূর হয়ে যায়।

[২]তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ (৩।২৮)
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ (১৪।১৯)
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ (১৩।২৯)

ভগবানকে ছাড়া আর কিছুই চান না তাঁর উদ্ধারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভগবানের উপর এসে যায়। এইজন্য ভগবান স্বয়ং সেই শরণাগত ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন[১], তাঁর সকল পাপ বিনাশ করেন[২], তাঁকে মৃত্যুরূপে সংসার সমুদ্র থেকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে দেন[৩] এবং তাঁকে তত্ত্বজ্ঞানও করিয়ে দেন[৪]। ভক্তিযোগের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ভক্ত ভগবৎকৃপায় ভগবানকে তত্ত্বত জেনেও যান, ভগবানকে দর্শন করেন এবং ভগবানকে পেয়ে যান।[৫]

গীতায় এই রকম অনেক অলৌকিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেইমতো আচরণ করে মানুষ তার পরম লক্ষ্য পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করতে পারে।

---
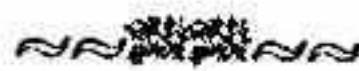
[১] অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (৯।২২)

[২] সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (১৮।৬৬)

[৩] তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ (১২।৭)

[৪] তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ (১০।১১)

[৫] ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ (১১।৫৪)

যোগঃ কর্মসু কৌশলম্

গীতা সমতাকেই যোগের পূর্ণতা বলে মনে করে। যদি সমতা এসে যায় তাহলে সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণগুলি নিজে থেকেই এসে যায়। যদি কোনো সাধকের অন্য সমস্ত লক্ষণ থাকে কিন্তু সমতা না হয় তাহলে তাঁর সাধনা অপূর্ণ। তাই গীতায় যেখানে সিদ্ধদের কথা বলা হয়েছে সেখানেই সমতার উল্লেখ আছে। তাৎপর্য হল, গীতার ধ্যেয় সমতা।

গীতার উপদেশ শুরু হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে। উপদেশের প্রারম্ভে ভগবান একাদশ শ্লোক থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত শরীরী-শরীর, সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য বিবেকের বর্ণনা করেছেন। আবার একত্রিশতম শ্লোক থেকে আটত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ক্ষাত্রধর্মের দৃষ্টিতে যুদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা করে উনচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন——

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু। (২।৩৯)

'এই (আটত্রিশতম শ্লোকে বর্ণিত[১]) সমতা সম্পর্কে সাংখ্যযোগে প্রথমে বলা হয়েছে। এবার তুমি একে যোগের বিষয়ে শোনো।'

সর্বপ্রথম এখানেই 'বুদ্ধি' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এর পূর্বে কোথাও 'বুদ্ধি' শব্দের উল্লেখ নেই। উনচল্লিশতম শ্লোক থেকে যে প্রকরণ শুরু হয়েছে তাতে 'সমতা'-কেই কোথাও বুদ্ধি শব্দের দ্বারা (২।২৯, ৪৯-৫১), কোথাও 'যোগ' শব্দের দ্বারা (২।৪৮, ৫০, ৫৩) এবং

---

[১]সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ (২।২৮)

'জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধে নিযুক্ত হও। এইভাবে যুদ্ধ করলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করবে না।'

কোথাও বুদ্ধিযোগ শব্দের দ্বারা (২।৪৯) বলা হয়েছে। আটত্রিশতম শ্লোকে ভগবান 'যোগ'-এর পরিভাষা জানিয়েছেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্চতে॥ (২।৪৮)

'হে ধনঞ্জয় ! তুমি আসক্তি ত্যাগ করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হয়ে যোগস্থিত থেকে কর্ম করো। কেননা সমতাকেই যোগ বলা হয়।'

এর পর পঞ্চাশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

বুদ্ধিযুক্তো যহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ (২।৫০)

'বুদ্ধি (সমতা)-র দ্বারা যুক্ত মানুষ বর্তমানেই পুণ্য এবং পাপ দুটিতে রহিত (নির্লিপ্ত) হয়ে যায়। অতএব তুমি যোগে (সমতায়) রত হও, কেননা কর্মে যোগই হল কুশলতা।'

এই শ্লোকের '**যোগঃ কর্মসু কৌশলম্**' পদটি বিচার করলে এর দুটি অর্থ পাওয়া যেতে পারে—

(১) '**কর্মসু কৌশলং যোগঃ**' অর্থাৎ কর্মে কুশলতাই হল যোগ।

(২) '**কর্মসু যোগঃ কৌশলম্**' অর্থাৎ কর্মেতে যোগই হল কুশলতা।

যদি প্রথম অর্থ অর্থাৎ 'কর্মে কুশলতাই যোগ' এটিকে নেওয়া যায় তাহলে তো যারা খুবই কুশলতার সঙ্গে, সাবধানতার সঙ্গে চুরি, লুণ্ঠন প্রভৃতি করে তাদের কর্মকেও 'যোগ' বলা যাবে। কিন্তু তা মনে করা উচিত নয়। আর এখানে নিষিদ্ধ কর্মের প্রসঙ্গও নেই। যদি এখানে শুভ কর্ম কুশলতার সঙ্গে সম্পাদন করাকেই যোগ মানা হয় তাহলে মানুষ কুশলতাপূর্বক সম্পূর্ণরূপে কৃত শুভকর্মগুলির ফলে বাঁধা পড়ে যাবে— '**ফলে সক্তো নিবধ্যতে**' (গীতা ৫।১২), তাহলে তার স্থিতি সমতায় থাকবে না এবং তার দুঃখনাশ হবে না।

শাস্ত্র বলেছে—'**কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ**' 'কর্মের দ্বারা মানুষ বাঁধা পড়ে যায়।' সুতরাং যে কর্ম স্বভাববশতই মানুষের বন্ধনকারী সেইটিই মুক্তি-দানকারীতে পরিণত হয়ে যায়—এটি প্রকৃতপক্ষে কর্মের কুশলতা। মুক্তি

যোগ (সমতা)-এর দ্বারা হয়, কর্মের কুশলতার দ্বারা হয় না। কর্ম যত ভালোই হোক না কেন তার আরম্ভ এবং শেষ আছে। এবং তার ফলেরও সংযোগ ও বিয়োগ হয়। যার আরম্ভ এবং শেষ আছে, সংযোগ ও বিয়োগ হয় তার দ্বারা মুক্তি লাভ কেমন করে হতে পারে ? বিনাশশীলের দ্বারা অবিনাশীর প্রাপ্তি কেমন করে হবে ? তাই গুরুত্ব হল যোগের, কর্মের নয়।

উপরোক্ত অর্থকেই যদি ঠিক বলে গ্রহণ করা হয় তাহলেও সমতা এবং নিষ্কামভাবকে 'কুশলতা'-র অন্তর্গত বলেই মনে করতে হবে অর্থাৎ কর্মে কুশলতা যদি যোগ হয় তাহলে 'কুশলতা' কী ? এর উত্তরে এই কথাই বলতে হবে যে, যোগ (সমতা)-ই হল কুশলতা। এই অবস্থায় কর্মে যোগই হল কুশলতা এই সোজা অর্থ কেন গ্রহণ করা হবে না ? উপরোক্ত পদে যখন 'যোগ' শব্দটি রয়েছে তখন 'কুশলতার' অর্থ যোগ—এটি মনে করার প্রয়োজন নেই।

যদি প্রকরণ অনুসারে চর্চা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে যোগ (সমতা)-এরই প্রকরণ চলছে, কর্মকুশলতার নয়। ভগবান **'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** (২।৪৮) কথার দ্বারা যোগের পরিভাষা জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব যোগই হল এই প্রকরণের বিধেয়। যোগই হল কর্মে কুশলতা অর্থাৎ কর্ম করবার সময় হৃদয়ে সমতা থাকবে, রাগ-দ্বেষ থাকবে না—এইটিই হল কর্মে কুশলতা। তাই **'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'**—এটি যোগের পরিভাষা নয়, বরং তা যোগের মহিমা।

এই (পঞ্চাশতম) শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান বলেছেন যে সমতায় অবস্থিত মানুষ পাপ এবং পুণ্য দুটি থেকেই নিবৃত্ত হয়ে যায়। মানুষ যদি পাপ এবং পুণ্য দুটি থেকেই নিবৃত্ত হয়ে যায় তাহলে আর কোন্ কাজ কুশলতার সঙ্গে করা হবে ?

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে কুশল শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে—

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ।।

'যে অকুশল কর্মে দ্বেষ করে না এবং কুশল কর্মে আসক্ত হয় না সেই ত্যাগী, বুদ্ধিমান, সন্দেহাতীত এবং আপন স্বরূপে স্থিত।'

এখানে 'অকুশল কর্মের' মধ্যে সকামভাবে-কৃত এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম এসে যায় এবং 'কুশলকর্মের' মধ্যে নিষ্কামভাবে-কৃত শাস্ত্রবিহিত কর্ম এসে যায়। অকুশল এবং কুশল কর্মের তো আদি-অন্ত হয় কিন্তু যোগ (সমতা)-এর আদি-অন্ত হয় না। রাগ-দ্বেষই হল বন্ধনকারী, কুশল-অকুশল কর্ম বন্ধনকারী নয়। অতএব অনুরাগবশত-কৃত কর্ম যত শ্রেষ্ঠই হোক না কেন তা বন্ধনকারীই। কেননা সেই কর্মের দ্বারা যদি ব্রহ্মলোকও পাওয়া যায় তাহলেও সেখান থেকে পিছনে ফিরে আসতে হবে—**'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন'** (গীতা ৮।১৬)। এই জন্য যে মানুষ দ্বেষপূর্বক অকুশল কর্ম ত্যাগ করেন না এবং কুশলকর্ম অনুরাগপূর্বক করেন না, তিনিই যথার্থ ত্যাগী, বুদ্ধিমান, সন্দেহাতীত এবং আপন স্বরূপে স্থিত।[১]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে **'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'** পদটির অর্থ 'কর্মে কুশলতাই যোগ' একথা মনে না করে 'কর্মে যোগই কুশলতা' এইরকমই মনে করা উচিত। এইবার 'যোগ' কাকে বলে তা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

গীতায় 'যোগ' শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে—(১) সমতা। যেমন—**'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** (২।৪৮), (২) সামর্থ্য, ঐশ্বর্য, প্রভাব। যেমন—

---

[১]দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নির্বততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৭।১১)

'যে মানুষ অনুকূলতা-প্রতিকূলতারূপ দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে তিনি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করেন, তবে তা দ্বেষ বুদ্ধিতে করেন না ; তিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম করেন, তবে তা গুণবুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ অনুরাগবশত করেন না। যেমন হাঁটুগেড়ে চলা শিশুর নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি রাগদ্বেষপূর্বক হয় না তেমনই রাগদ্বেষের অতীত মানুষের নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি রাগদ্বেষবশত হয় না। (শিশুরা তো অজ্ঞ কিন্তু রাগদ্বেষ মুক্ত মানুষের মধ্যে বিজ্ঞতা থাকে।)'

'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' (৯।৫) এবং (৩) সমাধি। যেমন—**'যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া'** (৬।২০)। যদিও গীতায় 'যোগ'-এর প্রধান অর্থ 'সমতা' তবু 'যোগ' শব্দের অন্তর্গত তিনটি অর্থই নিতে হবে।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধকে 'যোগ' বলা হয়েছে—**'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'** (১।২)। এই যোগের পরিণামস্বরূপ দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিত হয়ে যান—**'তদা দ্রষ্টুঃস্বরূপেঽবস্থানম্'** (১।৩)। এইভাবে পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের যে পরিণাম জানানো হয়েছে গীতা তাকেই 'যোগ' বলেছে।[১]

তাৎপর্য হল গীতা চিত্তবৃত্তিগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদপূর্বক স্বতঃসিদ্ধ সম-স্বরূপে স্বাভাবিক স্থিতিকে 'যোগ' বলেছে। এই সমতায় স্থিত হয়ে গেলে আর কখনো এর বিয়োগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ হবে না। তাই একে 'নিত্যযোগ' বলা হয়। চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ হয়ে গেলে 'নির্বিকল্প বোধ' হয়। কিন্তু সমতার স্বতঃসিদ্ধ স্থিতির অনুভূতি হলে 'নির্বিকল্প বোধ' হয়। নির্বিকল্প বোধ কোনো অবস্থা নয়। বরং সকল অবস্থার অতীত এবং তাঁর প্রকাশক এবং সকল যোগসাধনার ফল। এইভাবে গীতার যোগ পাতঞ্জল যোগদর্শনের যোগের তুলনায় খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

পরমাত্মা হলেন সম—**'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'** (গীতা ৫।১৯)। জীব পরমাত্মার অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭), অর্থাৎ সমরূপ পরমাত্মার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ অর্থাৎ যোগ নিত্য রয়েছে। এই স্বতঃসিদ্ধ নিত্যযোগেরই নাম হল 'যোগ'। এই নিত্য যোগ সব দেশ, কাল, পাত্র, ক্রিয়া, বস্তু, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনাতে বিদ্যমান। তাৎপর্য

---

[১] 'সমত্বং যোগ উচ্যতে' (২।৪৮)। 'সমতাকেই যোগ বলা হয়' এবং 'তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্' (৬।২৩)। 'যার মধ্যে দুঃখের সংযোগেরই বিয়োগ আছে, তাকে যোগ বলে জানা উচিত'। ভগবানের দৃষ্টিতে এই দুটিই যোগের পরিভাষা।

হল এই নিত্যযোগের সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ হয়নি, বিচ্ছেদ নেই, বিচ্ছেদ হবে না, বিচ্ছেদ হতে পারে না। কিন্তু অ-সৎ (শরীর)-এর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নিলে নিত্যযোগের অনুভূতি হয় না। দুঃখরূপ অ-সতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সংযোগের বিয়োগ (সম্বন্ধ বিচ্ছেদ) হলেই নিত্যযোগের অনুভূতি হয়ে যায়—**'তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্'** (গীতা (৬।২৩)। এইটিই হল গীতার মুখ্য যোগ আর এই যোগেরই অনুভূতি করাবার জন্য গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ প্রভৃতি সাধনার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সাধনাগুলিকে তখনই যোগ বলা হবে যখন অ-সতের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধের অনুভূতি হবে।

যে মূঢ় ও ক্ষিপ্র বৃত্তিসম্পন্ন নয় বরং বিক্ষিপ্ত বৃত্তিসম্পন্ন, কেবল সেই ব্যক্তিই পাতঞ্জল যোগদর্শন অনুসারে যোগের অধিকারী। কিন্তু যাঁরাই ভগবানকে লাভ করতে চান তাঁরা সকলেই গীতার যোগের অধিকারী। শুধু তাই নয়, যে মানুষ ভোগ এবং সংগ্রহকে গুরুত্ব না দিয়ে এই যোগকেই গুরুত্ব দেয় এবং একে লাভ করতে চায়—সেইরকম যোগের জিজ্ঞাসু মানুষও বেদে বর্ণিত কর্মগুলিকে অতিক্রম করে যায়—**'জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে'** (গীতা ৬।৪৪)।

এই যোগ (সমতা)-এর মহিমা ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশ-চল্লিশতম শ্লোকে চার রকমভাবে বলেছেন—

(১) **'কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি'**—সমতার দ্বারা মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

(২) **'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি'**—এর আরম্ভেরও বিনাশ হয় না।

(৩) **'প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে'**—এর অনুষ্ঠানের বিপরীত ফলও হয় না।

(৪) **'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'**—এর সামান্য অনুষ্ঠানও জন্মজন্মান্তররূপ মহা ভয় থেকে রক্ষা করে।

যদিও প্রথম কথাটির মধ্যেই পরের তিনটি কথা এসে যায় তবু সবগুলির মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে, যেমন—

(১) ভগবান প্রথমে সাধারণভাবে বলেছেন যে সমতায় যুক্ত মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। বন্ধনের কারণ গুণের সঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধ—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। সমতা এলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, তাতে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যেমন সংসারে অনেক শুভাশুভ কর্ম হতে থাকে, কিন্তু সেই কর্মগুলি আমাদের বাঁধে না। কেননা সেই কর্মগুলির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। অনুরূপভাবে সমতাযুক্ত মানুষের তার কর্মের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না।

(২) সমতার কেবল প্রারম্ভই যদি হয়ে যায় অর্থাৎ সমতা লাভ করার উদ্দেশ্য, জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়ে যায় তাহলে এই প্রারম্ভেরও বিনাশ হয় না। কেননা অবিনাশীর উদ্দেশ্যও অবিনাশী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিনাশ-শীলের উদ্দেশ্য বিনাশশীলই হয়ে থাকে। বিনাশশীলের উদ্দেশ্য বিনাশ (পতন) ঘটায় কিন্তু সমতা লাভের উদ্দেশ্য কল্যাণ সাধন করে—**'জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে'** (গীতা ৬।৪৪)।

(৩) সমতার উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল হয় না। সকামভাবে-কৃত কর্মে যদি মন্ত্রোচারণ, অনুষ্ঠানবিধি প্রভৃতিতে কোনো ত্রুটি ঘটে তাহলে তাতে বিপরীত ফল হয়।[১] কিন্তু যতটা সমতা অনুষ্ঠানে (জীবনে) এসে গিয়েছে

---

[১]এরকম ঘটনার উল্লেখ আছে যে ত্বষ্টা নামে একজন ইন্দ্রের হন্তারক পুত্রের ইচ্ছায় একটি যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে ঋষিরা 'ইন্দ্রশত্রুং বিবর্ধস্ব'—এই মন্ত্রের দ্বারা হোম করেছিলেন। 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দে যদি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয় তাহলে এর অর্থ হবে 'ইন্দ্রস্য শত্রুঃ' (ইন্দ্রের শত্রু) আর যদি বহুব্রীহি সমাস হয় তাহলে এর অর্থ হবে—'ইন্দ্র শত্রুর্যস্য' (যার শত্রু ইন্দ্র)। সমাসে ভেদ হলে স্বরেও ভেদ হয়ে যায়। অতএব ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দের উচ্চারণ অন্ত্যোদাত্ত হবে অর্থাৎ অন্তিম অক্ষর 'ত্রু'-র উচ্চারণ উদাত্ত স্বরে হবে, বহুব্রীহিতে সমাসের 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দের উচ্চারণ আদ্যোদাত্ত হবে অর্থাৎ প্রথম অক্ষর 'ই'-র উচ্চারণ উদাত্ত স্বরের দ্বারা হবে। ঋষিদের উদ্দেশ্য ছিল ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসবিশিষ্ট 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দটির অন্ত্যোদাত্ত উচ্চারণ করা। কিন্তু তাঁরা আদ্যোদাত্ত উচ্চারণ করে দিয়েছিলেন। এইভাবে (দুটি

তাতে যদি আচরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কোনো ভুল হয়ে যায়, সাবধানতায় যদি কিছু বিচ্যুতি ঘটে তবে তার বিপরীত ফল (বন্ধন) হয় না। যেমন, কেউ আমাদের কাছে চাকরি করে এবং অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালাতে গিয়ে লণ্ঠনের কাচটি ভেঙে ফেলে তাহলে আমরা তার উপর অসন্তুষ্ট হই। কিন্তু আমাদের কোনো বন্ধু, যে আমাদের কাছ থেকে কিছু চায় না ওইরকম অবস্থায় যদি তার হাত থেকেও লণ্ঠন পড়ে ভেঙে যায় তাহলে আমরা তার উপর বিরক্ত হই না। বরং বলি যে আমাদের থেকেও জিনিসপত্র ভেঙে যায়, তোমার হাত থেকে ভেঙেছে বলে চিন্তা করার কী আছে ? অতএব যে সকামভাবে কর্ম করে তার কর্মের তো বিপরীত ফল হতে পারে, কিন্তু যে কোনোরকম ফলাকাঙ্ক্ষী নয় তার অনুষ্ঠানের বিপরীত ফল কেমন করে হবে ?

(৪) সমতার যদি কিয়দংশও জীবনে আচরিত হয়, সামান্য একটু সমতার ভাব সৃষ্টি হয় তবে তা জন্ম-মরণরূপ মহা ভয় থেকে রক্ষা করে অর্থাৎ তা কল্যাণ করে। যেমন সকাম কর্ম ফল দিয়ে নষ্ট হয়ে যায় তেমনভাবে সমতা এই সামান্য ফল দান করে নষ্ট হয় না ; বরং তা পরিণামে কল্যাণই করে থাকে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি শুভ কর্ম যদি সকামভাবে করা হয় তবে তার বিনাশশীল ফল লাভ (ধন-সম্পদ-স্বর্গাদি প্রাপ্তি) হয়ে থাকে। আর সেগুলি যদি নিষ্কামভাবে করা হয় তবে তাতে অবিনাশী ফল (মোক্ষ) লাভ হয়ে থাকে। এইভাবে যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি শুভ কর্মগুলির তো দু রকম ফল হতে পারে কিন্তু সমতার ফল একটিই—তা হল কল্যাণ। যেমন, কোনো পথিক যদি চলতে চলতে

সমাসের অর্থ এক হওয়া সত্ত্বেও) স্বরভেদ হয়ে যাওয়ায় মন্ত্রোচারণের ফল বিপরীত হয়ে যায়। তাতে ইন্দ্রই ত্বষ্টার পুত্র (বৃত্রাসুর)-এর হন্তারক হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।। (পাণিনীয়শিক্ষা)

রাস্তায় থেমে পড়ে অথবা ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে সে যেখান থেকে চলা শুরু করেছিল সেখানে ফিরে যায় না। সে যেখানে পৌঁছিয়েছে সেই পর্যন্ত রাস্তা তো সে পার হয়ে গিয়েছে। তেমনই যতটা সমতা জীবনে অর্জিত হয়েছে যোগভ্রষ্ট হয়ে গেলেও তা বিনষ্ট হয় না। অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে অনেক বছর ধরে সুখভোগ করার পর অথবা মৃত্যুলোকে সজ্জনদের ঘরে সুখভোগ করবার পরও সেই সমতা বিনষ্ট হয় না (গীতা ৬।৪১-৪৪)।

উপসংহার

সমতা লাভের জন্য বুদ্ধির স্থিরতা খুবই প্রয়োজন। পাতঞ্জল যোগদর্শনে তো মনের স্থিরতা (বৃত্তিনিরোধ)-কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গীতা বুদ্ধির স্থিরতা (উদ্যোগের দৃঢ়তা)-কে গুরুত্ব দিয়েছে (২।৫৫-৬৮)। তার কারণ কল্যাণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মনের স্থিরতার বিষয়টি তত গুরুত্ব নয় যতটা গুরুত্ব বুদ্ধির স্থিরতার। মনের স্থিরতার দ্বারা লৌকিক সিদ্ধিগুলি পাওয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতার দ্বারা লৌকিক সিদ্ধি প্রাপ্ত না হয়ে পারমার্থিক সিদ্ধি (কল্যাণপ্রাপ্তি) হয়। কর্মযোগে বুদ্ধির স্থিরতাই প্রধান।[১] যদি মনের স্থিরতা হয় তাহলে কর্মযোগী কর্তব্য-কর্ম কী করে করবে ? কেননা মন স্থির হয়ে গেলে বাহ্যিক ক্রিয়া থেমে যায়। ভগবানও যোগে (সমতায়) স্থিত হয়ে কর্ম করার আদেশ দিয়েছেন—**'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (২।৪৮)। তাৎপর্য হল এই যে কর্মের গুরুত্ব নেই বরং যোগ অর্থাৎ সমতা-ই হল গুরুত্বপূর্ণ। অতএব কর্মে যোগ অর্থাৎ সম-ভাব থাকাই হল কুশলতা।

---
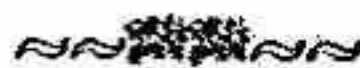
[১]ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।

বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্॥ (গীতা ২।৪১)

'হে কুরুনন্দন ! এই সমবুদ্ধি প্রাপ্তির বিষয়ে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একই হয়ে থাকে। অব্যবসায়ী মানুষদের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখাবিশিষ্ট হয়ে থাকে।'

গীতার তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা লৌকিক হওয়া সত্ত্বেও একটি অলৌকিক গ্রন্থ। এতে অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাব আছে। অদ্যাবধি গীতার উপর যত টীকা প্রকাশিত হয়েছে অন্য কোনো গ্রন্থে তা হয়নি। বাইবেলের অনুবাদ (ভাষান্তর) অনেক হয়েছে, কিন্তু টিকা একটাও হয়নি। বাইবেলের প্রচার রাষ্ট্রের এবং অর্থের প্রভাবে হয়েছে। কিন্তু গীতার প্রচার তার নিজস্বভাবে হয়েছে। তাৎপর্য হল, গীতার অভিপ্রায় অনুসন্ধানের জন্য যত প্রয়াস হয়েছে তত প্রয়াস অন্য কোনো গ্রন্থের জন্য করা হয়নি। তবু এই গ্রন্থের গভীরতার অন্ত পাওয়া যায়নি।

অল্প কথায় বললে, গীতার তাৎপর্য হল—মানুষমাত্রেরই কল্যাণ করা, শাস্ত্রে কল্যাণের অনেক পথের কথা বলা হয়েছে। গীতার টিকাগুলি দেখলেও তাতে দেখা যাবে যে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদভাব প্রভৃতি অনেক মতকে অবলম্বন করে টিকাগুলি রচিত হয়েছে। এইভাবে অনেক বাদ, সিদ্ধান্ত, মত-মতান্তর থাকা সত্ত্বেও গীতার সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। গীতা কারো মত খণ্ডন করেনি। কিন্তু নিজস্ব এমন এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা বলেছে যার কাছে সকলের মাথা নত হয়ে যায়। তার কারণ গীতা কোনো একটি বাদ, মত প্রভৃতিকে নিয়ে রচিত হয়নি। গীতা জীবমাত্রের কল্যাণকে নিয়েই কথিত হয়েছে।

আচার্যেরা নিজের মতকে 'সিদ্ধান্ত' বলে থাকেন। মত সর্বোপরি হয় না। প্রত্যেকেই নিজের মত প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্ত সর্বোপরি হয়, সকলকেই তা মানতে হয়। তাই গুরু-শিষ্যে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তভেদ হতে পারে না। কিন্তু গীতায় ভগবান নিজের সিদ্ধান্তকে 'সিদ্ধান্ত' না বলে 'মত' বলেছেন।

মযি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥

(৩।৩০-৩১)

'তুমি বিবেকবতী বুদ্ধিদ্বারা সমস্ত কর্তব্য-কর্ম আমার প্রতি অর্পণ করে কামনা, মমতা এবং সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্ম করো। যে মানুষ দোষদৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক আমার এই মতকে অনুসরণ করে সেও সকল কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।'

ভগবানের মতই যথার্থ এবং সর্বোপরি সিদ্ধান্ত। সকল মত-মতান্তর এর অন্তর্গত হয়ে যায়। তবু ভগবান অহংকার না করে খুবই সরলভাবে এবং নম্রতার সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্তকে 'মত' বলেছেন। তাৎপর্য হল ভগবান নিজের এবং অন্য কারোর মতের প্রতি আগ্রহ দেখাননি। তিনি নিরপেক্ষভাবে নিজের কথা উপস্থাপিত করেছেন।

ঈশ্বরবিশ্বাসী যতগুলি দার্শনিক সিদ্ধান্ত আছে তাদের সবগুলিতে প্রায়ই তিনটি বিষয়ের বর্ণনা আছে—পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং জগৎ। এই তিনটি বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। যেমন—জীবের সম্পর্কে কেউ বলেন যে এটি অনু-পরমাণু, কেউ বলেন এটি মধ্যম-পরিমাণ, আবার কেউ বলেন এটি মহৎ-পরিমাণ। জীবকে যাঁরা অনু পরমাণু বলে মানেন তারা বলেন যে একটি চুলকে চিরে দশ হাজার ভাগ করলে তার এক ভাগের সমান হল জীব পরিমাণ।[১]

জীবকে 'মধ্যম-পরিমাণ' মান্যকারীরা বলেন যে পিঁপড়ের মধ্যে পিঁপড়ে, মানুষের মধ্যে মানুষ এবং হাতির মধ্যে হাতির মতো বড় জীব

[১]বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (শ্বেতাশ্বতর. ৫।৯)

'চুলের ডগার একশ ভাগের আরও একশ ভাগ কল্পনা করলে যে ভাগ হয় জীবের স্বরূপকে সেই পরিমাণ মনে করতে হবে এবং তা অসীম ভাব পূর্ণ হতে সমর্থ।'

আছে। জীবকে মহৎ-পরিমাণ মান্যকারীরা বলেন যে জীব একটি শরীরে সীমিত নয়, বরং তা হল খুবই মহান। এইভাবে ঈশ্বরের বিষয়ে কেউ বলেন যে তিনি সগুণ, কেউ বলেন তিনি নির্গুণ, কেউ বলেন তিনি সাকার আবার কেউ বলেন তিনি নিরাকার। কেউ বলেন ইনি দ্বিভুজ, কেউ বলেন ইনি চতুর্ভুজ, কেউ বলেন ইনি সহস্রভুজ আবার কেউ বলেন ইনি বিরাট। কেউ বলেন ইনি ব্যক্ত, কেউ বলেন ইনি অব্যক্ত, কেউ বলেন ইনি অবতার গ্রহণ করেন, কেউ বলেন ইনি অবতার গ্রহণ করেন না প্রভৃতি। এইভাবে জগতের সম্পর্কে কেউ বলেন এ অনাদি এবং অনন্ত, কেউ বলেন এ অনাদি এবং সান্ত, কেউ বলেন এ অনাদি এবং পরিবর্তনশীল অর্থাৎ প্রবাহরূপে অবস্থানকারী প্রভৃতি। গীতা এই সমস্ত বাদ-বিবাদের মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি বলেছে যা তোমার কাছে দৃষ্ট হয় তাই 'জগৎ'। প্রত্যেকটি মানুষের 'আমি আছি' এই অনুভূতি হয়। এই হল 'জীব'। যিনি জড়- চেতন, অপরা-পরা সকলের স্বামী তিনি 'ঈশ্বর'।[১] গীতার এই কথায় সকল দার্শনিক এক মত। এখানেও একটি বিশেষ কথা হল এই যে

---

[১]ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্॥ (গীতা ২।১২) প্রভৃতি।

'কোনো সময়ে আমি ছিলাম না, তুমি ছিলে না এবং এই রাজারাও ছিলেন না— এমন কথা নয়। আবার এর পরেও এরা সকলে (আমি, তুমি এবং রাজারা) থাকবেন না এমন কথাও নয়।'

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎক্ষর মতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তম॥

(গীতা ১৫।১৬-১৮)

'এই সংসারে ক্ষর (বিনাশশীল) এবং অক্ষর (অবিনাশী)—এই দুরকমের পুরুষ আছে। সমস্ত প্রাণীর শরীর হল বিনাশশীল এবং কূটস্থ (জীবাত্মা) হল অবিনাশী। উত্তম

কেউ যদি ঈশ্বরকে না মানেন তাহলেও গীতার অনুসারে জীবন ধারণ করলে তাঁর কল্যাণ হবে।[১] গীতা আচরণের ক্ষেত্রে পরমার্থের বিশিষ্ট কলার কথা বলেছেন। তাতে করে প্রত্যেক মানুষ সমস্ত রকম পরিস্থিতিতে থেকেও নিষিদ্ধরহিত সব রকমের আচরণের দ্বারা নিজের কল্যাণ সাধন করতে পারে।[২]

অন্য গ্রন্থগুলি তো এই কথা বলে যে যদি নিজের কল্যাণ চাও তাহলে সবকিছু ত্যাগ করে সাধু হয়ে যাও, কেননা টাকা-পয়সা রোজগার এবং পরমার্থ দুটি একসঙ্গে হয় না। কিন্তু গীতা বলে যে আপনি যেখানে আছেন, আপনি যে মতাবলম্বী হোন, যে সিদ্ধান্ত মানেন, যে ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতিকে আপনি স্বীকার করেন সেগুলিকে মেনেও যদি আপনি গীতার নির্দেশ অনুসারে চলেন তাহলেও আপনার কল্যাণ হবে। তাৎপর্য হল, এই যে কোনো মানুষ সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান, ইহুদি, পারসি

পুরুষ তো স্বতন্ত্র। তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত। সেই অবিনাশী ঈশ্বর তিনটি লোকে প্রবিষ্ট হয়ে সকলের ভরণ-পোষণ করেন। আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকেও উত্তম। এইজন্য লোকে এবং বেদে আমি 'পুরুষোত্তম' নামে অভিহিত হই।

[১]দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ (গীতা ৩।১১)

'নিজেদের কর্তব্য-কর্মের দ্বারা তোমরা দেবতাদের উন্নত করো এবং সেই দেবতারা তাঁদের কর্তব্য-কর্মের দ্বারা তোমাদের যেন উন্নত করেন। এইভাবে একে অপরকে উন্নত করতে করতে তোমরা পরম কল্যাণ লাভ করবে।'

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। (গীতা ১৮।৪৫)

'নিজের নিজের কর্তব্যে তৎপরতার সঙ্গে নিযুক্ত মানুষ সম্যক্ সিদ্ধি (পরমাত্মা) লাভ করেন।'

[২]সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।

মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ (গীতা ১৮।৫৬)

'আমার আশ্রয় গ্রহণকারী ভক্ত সব সময় সকল বিহিত কর্ম করতে থাকলেও আমার কৃপায় শাশ্বত অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন।'

যাই হোক ; সে যে কোনো মত, সিদ্ধান্তকেই অনুসরণ করুক তার উদ্দেশ্য যদি হয় নিজের কল্যাণ সাধন করা তাহলে সে গীতার মধ্যে তার কল্যাণের সম্পূর্ণ নির্দেশ পেয়ে যাবে। জাগতিক দায়িত্ব পালন করেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব, ভগবদ্‌ভক্তি সম্ভব, যোগ সাধন সম্ভব, লয় যোগ, রাজযোগ, মন্ত্রযোগ প্রভৃতি যোগপ্রাপ্তি সম্ভব—এই রকম বিশিষ্ট কথা গীতায় বলা হয়েছে। সেই বিশিষ্ট কথাটি কী তা এখন বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা যেসব আচরণ করে থাকি তাতে নিজেদের স্বার্থ এবং অহংকার ত্যাগ করে সকলের হিতসাধনের চেষ্টা করতে হবে। সকলের হিতসাধনের অর্থ হল বর্তমানে কল্যাণ হোক এবং ভবিষ্যতেও কল্যাণ হোক, আমাদের কল্যাণ হোক এবং অন্যদেরও কল্যাণ হোক—এই দৃষ্টি নিয়ে কাজ করা। এমন করলে খুব সহজেই পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হয়ে যাবে। একান্তবাসী হয়ে অনেক বছর ধরে সাধনার পর মুনি-ঋষিরা যে তত্ত্ব লাভ করতেন গীতার নির্দেশ অনুসারে আচরণ করলে সেই তত্ত্ব পাওয়া যাবে। সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থেকে কর্ম করাই গীতার নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা। গীতা বলেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ (২।৩৮)

'জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধে নেমে পড়। এইভাবে যুদ্ধ করলে তোমার পাপ হবে না।'

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্চতে॥ (২।৪৮)

'হে ধনঞ্জয় ! তুমি আসক্তি ত্যাগ করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হয়ে যোগে স্থিত থেকে কর্ম করো, কেননা সমত্বকেই যোগ বলা হয়।'

সংসারের স্বরূপ হল—ক্রিয়া এবং পদার্থ। পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করা প্রয়োজন। এইজন্য গীতা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—তিনটি যোগের দৃষ্টিতেই ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের কথা বলেছে। যেমন—কর্মযোগী

ক্রিয়া এবং পদার্থের প্রতি নিজের আসক্তি দূর করে পরার্থে সেগুলিকে ব্যবহার করেন,[১] জ্ঞানযোগী ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে অসঙ্গ হয়ে যান,[২] আর ভক্তিযোগী ক্রিয়া এবং পদার্থকে ভগবানে অর্পণ করেন।[৩] সকল কর্ম এবং বস্তু ভগবানকে অর্পণ করলে মানুষ সহজেই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গিয়ে ভগবানকে লাভ করে। ভগবানকে অর্পণ করলে কর্ম এবং বস্তু থাকবে না এমন কথা নয়, বরং সেগুলি মহান পবিত্র হয়ে যাবে। যেমন, ভক্তেরা ভগবানকে যে ভোগ দেন সেই ভোগ্য বস্তু যেমনকার তেমনই পেয়ে যান, কম হয় না, কিন্তু সেই বস্তু মহান পবিত্র হয়ে যায়। তেমনই সংসারে আমরা যদি কোনো বস্তুকে নিজেদের বলে মনে না করে অপরের সেবার জন্য মনে করি তাহলে সেই বস্তু মহান পবিত্র হয়ে যায়।

---

[১]যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেসু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ (গীতা ৬।৪)

'যে সময়ে ইন্দ্রিয়গুলির ভোগে এবং কর্মে আসক্ত হন না সেই সময়ে সেই সকল সংকল্প ত্যাগী মানুষকে যোগারূঢ় বলা হয়ে থাকে।'

[২]তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ (গীতা ৩।২৮)

'হে মহাবাহো ! গুণ-বিভাগ এবং কর্ম-বিভাগকে যে মহাপুরুষ তত্ত্বগতভাবে জানেন তিনি 'সকল গুণই গুণের মধ্যে আচরণ করে'—এটি জেনে নিয়ে তাতে আসক্ত হন না।'

[৩]পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ॥
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গীতা ৯।২৬-২৭)

'যে ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি (যথাসাধ্য) প্রাপ্ত বস্তু ভক্তি সহকারে আমাকে অর্পণ করে, আমাতে তল্লীন অন্তকরণবিশিষ্ট সেই ভক্তের দ্বারা ভক্তি সহকারে প্রদত্ত উপহার আমি গ্রহণ করি।

হে কুন্তীপুত্র। তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যে যজ্ঞ কর, যা দান কর, যে তপস্যাই কর সব কিছু আমাকে অর্পণ করে দাও।'

আর যে বস্তুকে কেবল নিজেদের বলে মনে করি সেই বস্তু ভীষণ অপবিত্র হয়ে যায়।

মনে করুন কোনো লোক নিজের রান্না করছে। এমন সময় হঠাৎই একজন ভিক্ষুক সেখানে এসে ভিক্ষা চাইল আর সেই লোকটি খুবই যত্ন সহকারে তাকে ভিক্ষা দিল। সেই অন্ন তখন খুবই পবিত্র হয়ে গেল। কিন্তু যখন সেই লোকটি খাবার থালায় বেড়ে নেয় তখন সেই অন্ন ততটা পবিত্র হয় না। কেননা তখন তাতে 'আমি খাব' এই ভাবটি থাকে। এখন যদি ভিক্ষুক আসে তখন তাকে সেই অন্ন দিতে লোকটির সংকোচ হয়ে থাকে আর ভিক্ষুকেরও তা নিতে সংকোচ হয়, তাহলেও ভিক্ষুক তা থেকে কিছুটা অন্ন নিতে পারে। কিন্তু সেই লোকটি যদি খেতে বসে পড়ে আর গ্রাস নিতে উদ্যত হয় তখন আর সেই অন্ন আগের মতো শুদ্ধ থাকে না। যদি সে সেই গ্রাস মুখে তুলে নেয় তাহলে তা অশুদ্ধ, এঁটো হয়ে যায়। যখন সে সেই গ্রাস গিলে ফেলে তখন (নিজেই খেয়ে ফেলার দরুন) তা খুবই অশুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কোনো কারণে বমি হয়ে যায় তাহলে সেই বমি করা খাদ্য খুবই অশুদ্ধ হয়। যদি বমি না হয় তাহলে তা ভীষণ অশুদ্ধ হয়ে মলে পরিণত হয়। পরের দিন সে জঙ্গলে মল ত্যাগ করে। পরে রোদ্দুর, হাওয়া, বৃষ্টি প্রভৃতির কারণে সেই মল যথাসময়ে মাটির সঙ্গে মিশে মাটি হয়ে যায়। তখন তা এতই শুদ্ধ হয়ে যায় যে ময়লা কোথায় ছিল তা বোঝাই যায় না। ওই মাটি অন্য বস্তুকেও (বাসন ইত্যাদি) শুদ্ধ করে দেয়। এটি হল ত্যাগের মাহাত্ম্য। এইভাবে নিজের জন্য তৈরি করা শুদ্ধ খাবারও অশুদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ত্যাগ করলে খুবই অশুদ্ধ বস্তু (মল-মূত্রাদি)ও শুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং যে বস্তুগুলি আমরা স্বার্থবশত নিজেদের এবং নিজেদের জন্য মনে করি সেই বস্তুগুলিকে আমরা অশুদ্ধ করে দিই। তার কারণ পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সকলের জন্য, তাতে সকলের অংশ থাকে। গীতা বলেছে—

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ (৩।১৩)

'যারা কেবল নিজেদের জন্য রান্না করে সেই পাপীরা তো কেবল পাপকেই ভক্ষণ করে।'

আমার কাছে যা আছে তা সকলের জন্য, আমার একার জন্য নয়—এই উদার ভাব থেকে খুবই শান্তি পাওয়া যায়। রান্না হয়ে গেলে যদি কোনো ক্ষুধার্ত এসে যায়, অতিথি আসে, ভিক্ষুক আসে, কুকুরও আসে তো সাধ্যানুসারে তাদের কিছু দিয়ে দিন। তারা যদি সবটা চায় তাহলে তাদের বলবেন ভাই, সবটা কী করে দেব, আমাকেও তো নিতে হবে, তুমি তোমার ভাগটাই নাও। আমরা অপরকে খাওয়াতে পারি, কিন্তু তাদের ইচ্ছাপূর্তি করতে পারি না। শুধু তাই নয়, পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ মিলিতভাবেও কোনো একজনের ইচ্ছাপূর্তি করতে পারে না—

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৯।১৩)

'পৃথিবীতে যত ধান্য, স্বর্ণ, পশু এবং নারী আছে তারা সকলে মিলিতভাবেও সেই পুরুষের মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না যে কামনার তাড়নায় জর্জরিত।'

আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তা সকল প্রাণীর উদ্ধার চায়। রাজস্থানে আমি দেখেছি যে যখন কৃষকেরা কৃষিকাজ করে তখন তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, হে প্রভু! পশুর ভাগ্য, পাখির ভাগ্য, কীট-পতঙ্গের ভাগ্য, পথিক-দুর্জনের প্রভৃতির ভাগ্যের বস্তু আমাদের হাতে দিন। এর তাৎপর্য কৃষি কেবল আমাদের নিজেদের জন্য নয়, বরং তা সকলের জন্য। ফসল যখন পাকে, যখন সর্বপ্রথম ফল আসে তখন তা নিজেদের জন্য নেওয়া হয় না। প্রথমে তা মন্দিরে অথবা ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় কিংবা কোনো সাধুর কাছে পাঠান হয়, তারপর নিজেদের জন্য গ্রহণ করা হয়। তেমনই রান্না তৈরি হয়ে গেলে প্রথমে অতিথিদের দিয়ে তারপর গ্রহণ করা হয়। রান্না হয়ে গেলে 'বলিবৈশ্বদেব' করার বিধান আছে। তাতে সমগ্র বিশ্বকে অন্ন অর্পণ করা হয়। কেউ মারা গেলে তার জন্য শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ করা হয়। শুধু তাই নয়, সকল জীব, দেবতা এবং ঈশ্বরকেও পিণ্ড এবং জলদান করা হয়। ভগবানের মধ্যে কোনো ন্যূনতার সম্ভাবনাই নেই,

কিন্তু যেমন সন্তান পিতার জিনিস পিতাকে অর্পণ করলে তিনি প্রসন্ন হন তেমনই ভগবানের জিনিস ভগবানকে অর্পণ করলে ভগবানও প্রসন্ন হন। সমুদ্রকে জল দেওয়া হয় এবং সূর্যকেও প্রদীপ দেখান হয়, আরতি করা হয়। সমুদ্রে কি জল নেই, নাকি সূর্যে আলো নেই ? সেগুলিতে ন্যূনতা কিছু নেই তবু আমাদের উদার ভাব, সকলকে সেবা করার ভাব, সকলের সুখবিধানের ভাবটি সকলেরই কল্যাণ করে—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্‌ভবেৎ ॥

এই কথাটিকেই গীতা '**সর্বভূতহিতে রতাঃ**' (৫।২৫, ১২।৪) পদে বর্ণনা করেছে, সকলকে দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে 'যজ্ঞশেষ' বলা হয়। গীতায় বলা হয়েছে—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ। (৩।১৩)

'যজ্ঞাবশিষ্ট গ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ মানুষ সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান।'

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (৪।৩১)

'যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত গ্রহণকারী সনাতন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।'

কর্মযোগী সকল বস্তু সংসারে অর্পণ করেন, জ্ঞানযোগী অর্পণ করেন প্রকৃতিকে আর ভক্তিযোগী ভগবানকে অর্পণ করেন। যাকে খুশি অর্পণ করুন, কেবল নিজের বলে মনে করবেন না—এইটিই আসল কথা। বাস্তবে বস্তু কল্যাণ করে না, আমাদের উদার ভাবই কল্যাণ করে। বস্তু যদি কল্যাণকারী হয় তাহলে লাখপতি বা কোটিপতিরা তো নিজেদের কল্যাণ করে নেবেন, সাধারণ মানুষ নিজেদের কল্যাণ করতে পারবেন না। আসলে ত্যাগীদেরই কল্যাণ হয়, সংগ্রহকারীদের কল্যাণ হয় না। অতএব এত অর্থ ব্যয় করলে কল্যাণ হবে, এত বস্তু দিলে কল্যাণ হবে—এমন কথা নয়। সকলের মঙ্গল হোক, সকলে সুখী হোক, আমাদের এই ভাব থেকেই কল্যাণ হবে। ভগবান ক্রিয়াগ্রাহী বা বস্তুগ্রাহী নন, তিনি ভাবগ্রাহী—'**ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ**'। তাই প্রত্যেকটি কাজে পরহিতের ভাব

রাখতে হবে। এতে খরচ খুব সামান্য, কিন্তু লাভ প্রচুর। সামান্য খরচ যা তা হল, কোনো অভাবী যদি সামনে এসে যায় তাহলে তাকে কিছু খাদ্য দাও, জল, কিছু কাপড় দাও, একটু আশ্রয় দাও, তাকে কিছু সাহায্য করো। যদি এমন সুযোগ এসে যায় যে নিজে অভুক্ত থেকে অপরকে খেতে দিতে হবে তবে তার জন্য চিন্তা নেই। আমরা যেদিন একাদশীব্রত করি সেদিন তো উপবাসী থাকি। যখন দেশ বিভাগ হয়েছিল তখন পাকিস্তান থেকে আগত কিছু মানুষ দশ টাকা দিয়েও এক গ্লাস জল পায়নি। তাই সব সময় অন্ন-জল পাওয়া নিজেদের হাতের মধ্যে নয়, কখনো কখনো ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত থাকতে হয়। যদি অপরের কল্যাণের জন্য ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত থেকে যান তাহলে তাতে কল্যাণই হবে।

এইভাবে যা কিছু করা হবে তা যেন সকলের হিত সাধনের জন্য করা হয়। মানুষ যে কোনো ধর্মের, সম্প্রদায়ের মত মতান্তর, বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতির হোক না কেন—যে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না করে সকলের হিতসাধনের ভাব পোষণ করে তার কল্যাণ হয়।

অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

(পঞ্চতন্ত্র, অপরীক্ষিতঃ ৩৭)

'এটি নিজের এবং এটি অপরের—সঙ্কুচিত হৃদয়ের মানুষ এই রকম ভাব পোষণ করেন। উদার হৃদয়ের মানুষদের কাছে সমগ্র বিশ্বই নিজের স্বজন।'

তাৎপর্য হল উদার ভাবের মানুষেরা সমস্ত কাজ সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য করে থাকেন। রামায়ণে আছে—

উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ। মন্দ করত জো করই ভলাঈ॥

(রামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪১।৪)

সাধুসন্তরা তাদেরও ভালো করেন যারা তাঁদের প্রতি অন্যায় করেন। রাবণের কাছে পাঠাবার সময় ভগবান রাম অঙ্গদকে বলেছিলেন যে শত্রুর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলবে যাতে আমাদের কাজ (সীতাকে উদ্ধার) হয়ে যায় এবং তারও হিতসাধন হয়—

কাজু হমার তাসু হিত হোঈ। রিপু মন করেহু বতকহী সোঈ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, লঙ্কাকাণ্ড ১৭।৪)

মানুষের মধ্যে এই উদারভাব আসে ত্যাগের ফলে। এইজন্য গীতায় ত্যাগের খুব মহিমা আছে। ত্যাগে তাৎক্ষণিক শান্তি পাওয়া যায়—'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্' (গীতা ১২।১২)। মানুষ মল-মূত্রের মতো বস্তুও ত্যাগ করে এক প্রকারের শান্তি অনুভব করে, তার চিত্ত প্রসন্ন হয়, শরীর হাল্কা হয়, রোগমুক্তি হয়। যখন এরূপ ময়লা জিনিস ত্যাগ করাতেই এত মাহাত্ম্য তখন অপরের হিতার্থে অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি ত্যাগ করায় কতই না মাহাত্ম্য ! ত্যাগের বিষয়ে একটি মার্মিক কথা হল, যে বস্তু নিজের নয়, তাকেই ত্যাগ করা হয়। তাৎপর্য হল বস্তুটি নিজের নয়, ভুল করে নিজের মনে করা হয়েছিল, এই ভুলকেই ত্যাগ করা হচ্ছে। আমরা যখন মনুষ্য শরীর নিয়ে জন্মেছিলাম তখন নিজেদের সঙ্গে কিছুই আনিনি। দেহও মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম আর যখন চলে যাব তখন কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাব না। কিন্তু আমরা এখানকার বস্তুগুলিকে নিজের মনে করে তার মালিক হয়ে যাই। অতএব এই মনে করে সেই বস্তুগুলিকে মন থেকে ত্যাগ করতে হবে যে এগুলি আমাদের নয়, সকলের আর এইটিই বাস্তব। শুধু এইটুকুতেই আমাদের কল্যাণ হয়ে যাবে। গীতা বলেছেন—

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ (২।৭১)

অর্থাৎ শরীরে 'আমিত্ব' এবং বস্তুগুলিতে 'আপনত্ব' ত্যাগ করলে শান্তি পাওয়া যায়, কল্যাণ হয়ে যায়। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কোনো কিছুই আমার নয়। এগুলিকে যদি বিশ্ব সংসারের বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে কর্মযোগ হয়ে যাবে, যদি প্রকৃতির বলে মানা হয় তাহলে জ্ঞানযোগ হয়ে যাবে আর ভগবানের বলে মেনে নিলে ভক্তিযোগ হয়ে যাবে। যদি এগুলিকে নিজের বলে মানেন তাহলে জন্ম-মরণ যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ জন্ম-মরণ হবে, কিছুই পাওয়া যাবে না। যা নিজের নয় তা কী করে পাওয়া যাবে ? নিজের কাছে থাকবে কী করে ? গীতা বলে, এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধির দ্বারা যে কাজই করো সকলের কল্যাণের জন্যই করো—

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ (৪।২৩)

'যজ্ঞের নিমিত্ত অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে কেবল অপরের কল্যাণকারী মানুষের সকল কর্ম বিলীন হয়ে যায়।'

রামায়ণে আছে—

পরহিত বস জিন্হ কে মন মাহী। তিন্হ কহুঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ॥

(রামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩১।৫)

পর হিত সরিস ধর্ম নহিঁ ভাঈ। পর পীড়া সম নহিঁ অধমাঈ॥

(রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪১।১)

অপরের হিতসাধন করলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ— তিনটিই সিদ্ধ হয়। সগুণ এবং নির্গুণ দুটিরই প্রাপ্তি হয় অপরের হিত সাধনে। সগুণ প্রাপ্তি সম্পর্কে গীতা বলেছে—

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ (১২।৪)

'যারা সকল প্রাণীর কল্যাণে রত এবং সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন তারা আমাকে (সগুণকে) প্রাপ্ত করে।'

আর নির্গুণ প্রাপ্তির সম্পর্কে বলেছে—

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মনঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥

'যাঁরা শরীর-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির প্রভাব থেকে মুক্ত, যাঁরা সকল প্রাণীর হিত-সাধনে রত, যাঁদের সংশয় দূর হয়ে গিয়েছে, যাঁদের সকল কল্মষ (দোষ) নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেই সকল বিবেকবান সাধক নির্বাণ ব্রহ্মকে (নির্গুণকে) লাভ করেন।'

হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পারসি, ইহুদি প্রভৃতি যাই হোন তিনি যদি নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে, নিয়মগুলিকে পালন করার সময় ত্যাগের মনোভাব পোষণ করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুকে নিজের বলে মনে না করেন তাহলে তাঁর কল্যাণ হয়ে যাবে। ত্যাগে সকলে এক হয়ে যান, কোনো মতভেদ থাকে না। যেমন, কেউ দেবতাদের পূজা করেন, কেউ ঋষিদের পূজা করেন, কেউ মা-বাবার পূজা করেন ইত্যাদি। কিন্তু নিয়ম-পালনে

ভিন্নতা হলেও অপরের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে স্বার্থ এবং অহংকার ত্যাগ করাতে সকলে এক হয়ে যায়। যাঁদের মধ্যে নিজেদের স্বার্থ এবং অহংকার ত্যাগের প্রাধান্য থাকে সেই মত, সিদ্ধান্ত, সম্প্রদায়, গ্রন্থ, ব্যক্তি প্রভৃতি মহান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যাদের মধ্যে নিজেদের স্বার্থ এবং অহংকার প্রধান সেইসব মত, সিদ্ধান্ত, গ্রন্থ, ব্যক্তি প্রভৃতি খুবই নিকৃষ্ট।

সকলের কল্যাণ করলে নিজের কল্যাণ নিঃখরচায় স্বাভাবিকভাবে হয়ে যায়। তাই আমাদের নতুন কোনো কাজ করতে হবে না, বরং নিজেদের এই ভাব রাখতে হবে যে আমাদের সম্পত্তি সকলের জন্য। আমরা তো সম্পত্তির রক্ষক। যেমন প্রয়োজন হলে আমরা অন্ন, জল, বস্ত্র প্রভৃতিকে নিজেদের কাজে লাগাই, তেমনই প্রয়োজন হলে অন্ন, জল, বস্ত্র, ওষুধ যেন অপরের জন্য দিয়ে দিই। নিজেদের প্রয়োজন হলে যেমন বস্তু নিই তেমনি অপরের প্রয়োজনেও যেন বস্তু দিয়ে দিই।

সকলের কল্যাণ করার ভাব প্রত্যেক মানুষই রাখতে পারেন। এই ভাব গৃহস্থ রাখতে পারেন, সাধু-সন্ন্যাসীরা রাখতে পারেন, দরিদ্রতম মানুষও রাখতে পারেন। সবচেয়ে বেশি ধনী যিনি তিনিও রাখতে পারেন। আমাদের কাছে যেসব জিনিস আছে সেগুলি কার, তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু কোনো অভাবী মানুষ যদি সামনে এসে যায় তাহলে সেগুলি তার—এইকথা মনে করে তাকেই সেগুলি দিয়ে দিতে হবে '**ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে।**' যেমন আমার কাছে কোনো ভদ্রলোক হয়তো এসে বললেন, 'ভাই, এখন আমাকে মেলায় যেতে হবে। আমার কাছে হাজার খানেক টাকা রয়েছে। যাতে পকেট কাটা না যায় তাই তোমার কাছে টাকাটা রেখে যাচ্ছি।' তিনি টাকা রেখে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে টাকা চাইলেন এবং আমি টাকাটা দিয়ে দিলুম। এটা কি দান করা হল ? দান নয়, তাঁর জিনিসই তাঁকে ফেরত দেওয়া হল।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে রান্না হয়ে যাবার পর যদি কোনো ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী এসে যান তাহলে তাঁকে না খেতে দিলে পাপ হয়। এর শুদ্ধি হয় চন্দ্রায়ণব্রত করলে। তাঁকে যদি অল্প একটু খাদ্যও দেওয়া হয় তাহলে

আমাদের ধর্মপালন হয়ে যায় এবং পাপ হয় না। আমিই রোজগার করেছি, তা দিয়ে জিনিস পত্র কিনেছি এবং তাতে রান্না হয়েছে এখন কোনো সন্ন্যাসী এলে তাকে খাদ্য না দিলে পাপ হওয়াটা কি ন্যায়সঙ্গত ? এমন সংশয় মনে হতে পারে। এর উত্তর হল, যিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন এবং যিনি নিজের কাছে কিছুই রাখেননি তাঁর অধিকারের ধন কোথায় গেল ? যদি তিনি চাইতেন তাহলে দোকান করে, কৃষিকাজ করে, লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের জীবন নির্বাহের মতো অর্থ উপার্জন করতে পারতেন, টাকা-পয়সা সঞ্চয় করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেই কাজ করেননি। তাহলে সেই টাকা তো আমাদের কাছেই থেকে গিয়েছে ! তাই যথা সময়ে খাবার জন্য তিনি এসে গেলে তাঁকে ভোজন করানোই আমাদের কর্তব্য। তা না করলে তাঁর কাছে আমরা ঋণী থেকে যাব, আমাদের পাপ হবে।

সাধুদের ভিক্ষাবৃত্তিকে শাস্ত্রে খুবই পবিত্র বলা হয়েছে। কেননা কয়েকটি ঘরে কিছু কিছু নিলে দাতার উপর চাপ পড়ে না এবং গ্রহীতারও উদর পূর্তি হয়ে যায়। এইজন্য একে 'মাধুকরী' বৃত্তি বলা হয়। 'মধুকর' হল মৌমাছি। মৌমাছি প্রত্যেকটি ফুল থেকে একটু-একটু করে রস সংগ্রহ করে এবং ফুলেরও ক্ষতি করে না। একজন সাধু ছিলেন। তাঁকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কোথায় খান ? সঙ্গে তো একটা পয়সাও নেই ? সাধু বলেছিলেন 'ভিক্ষা করি'। আবার প্রশ্ন হল, 'কখনো যদি ভিক্ষা না পান তাহলে ?' সাধু বলেছিলেন, 'তখন তো ক্ষুধাকেই ভোজনরূপে গ্রহণ করি অর্থাৎ তখন আমি ভোজন করব না, পরের দিন ভিক্ষা করব।'

সংসারে কারো কাছ থেকে কিছু না নিয়ে, কোনো সেবা গ্রহণ না করে কারো জীবন নির্বাহ হতে পারে না। রাজা-মহারাজা যেই হোন, নিজের জীবন নির্বাহের জন্য তাঁকে অপরের কিছু না কিছু সাহায্য নিতেই হয়। তাই গীতা বলেছে—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ (৩।১১)

'নিজেদের কর্তব্য-কর্মের দ্বারা তোমরা দেবতাদের উন্নত করো এবং দেবতারা তাঁদের কর্তব্য পালনের দ্বারা তোমাদের উন্নত করবেন। এইভাবে একে অপরকে উন্নত করার মাধ্যমে তোমরা পরম কল্যাণ লাভ করবে।'

একে অপরের পূজা (সেবা) করতে করতে পরম কল্যাণ প্রাপ্ত করবে এটি কতই না বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা !

কয়েক বছর আগের কথা। বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ হলে গীতাপ্রেসের সংস্থাপক, সঞ্চালক তথা সংরক্ষক শ্রীজয়দয়াল গোয়েন্দকা সেখানকার কয়েকটি জায়গায় কীর্তনের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে দু ঘন্টা করে কীর্তন করবে সে আধ সের করে চাল নিয়ে যাবে। পয়সা দিলে তারা মাছ, মাংস কিনবে, কিন্তু চাল দিলে তারা ভাত খাবে। তাই তিনি অন্ন দেওয়া শুরু করেছিলেন। একদিন তিনি কাজের ব্যবস্থা দেখতে গিয়ে একটি ক্যাম্পে রাত্রিবাস করেছিলেন। সেখানে অনেক বাঙালি ভদ্রলোক একত্রিত হয়ে শ্রীগোয়েন্দকাজীর খুব প্রশংসা করছিলেন এবং বলেছিলেন যে আপনি আমাদের জেলাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। জয়দয়ালজী বলেছিলেন, আপনারা আমার মিথ্যা প্রশংসা করছেন। আমি এমনকী আর খরচ করেছি ? আমরা মারওয়াড় (রাজস্থান) থেকে এখানে এসেছিলাম। এখানে এসে আপনাদের জায়গায় বসে আমরা যত উপার্জন করেছি তার সবই যদি দিয়ে দিই তাহলেও আপনাদের জিনিস আপনাদেরই দেওয়া হবে। আমাদের নিজেদের জিনিস কী আর দিয়েছি ? তারও সবটা দেওয়া হয়নি। তার সব যদি দিয়ে দিই তাহলেই বলা যাবে যে আমরা দিয়েছি। এইভাবে প্রত্যেককে তারই জিনিস তাকে দেওয়া হচ্ছে মনে করে দিতে হবে। এতে আমরা ঋণমুক্ত হয়ে যাব, নইলে ঋণী থেকে যাব। নিজেদের মধ্যে সেবকত্বের অহংকারও থাকা উচিত নয়, বাড়িতে রান্না হলে শিশুরা খায়, মেয়েরা খায়, পুরুষেরাও খায়। কেননা তাতে সকলেরই অংশ আছে। এই রকম যদি অভুক্ত কেউ আসে, কুকুর আসে, কাক আসে

তাহলেও তারও তাতে ভাগ আছে। তার ভাগের জিনিস তাকে দিয়ে দিন। এইরকম নিষ্কামভাবে আচরণ করলে আমাদের কল্যাণ হবে।

গীতায় আছে—

স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ (১৮।৪৬)

'নিজের নিজের কর্মের দ্বারা সেই পরমাত্মার পূজন করে মানুষ তাঁকে লাভ করে।'

তাৎপর্য হল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত কর্মের দ্বারা পূজা করবেন, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়োচিত কর্মের দ্বারা পূজা করবেন, বৈশ্য বৈশ্যোচিত কর্মের দ্বারা পূজা করবেন এবং শূদ্র শূদ্রোচিত কর্মের দ্বারা পূজা করবেন। এইভাবে সকলের পূজা, সকলের হিতসাধন করলে নিজেদের কল্যাণ হয়ে যাবে। এই কথা গীতায় খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যদি আমরা সুখ চাই তাহলে অপরের সুখবিধান করাও আমাদের কর্তব্য। যদি আমরা নিজেদের কিছু না রাখি তাহলে অপরকে দেওয়ার বিধান আমাদের উপর প্রযোজ্য হয় না। আয়কর দিতে হয়। আমরা রোজগার করেছি। তার উপরই কর দিতে হয়। আমরা যদি রোজগার নাই করে থাকি তাহলে তার কর দিতে হবে কেন ? তাই যদি আমরা নিজেদের কাছে বস্তুসামগ্রী রাখি তাহলে সেগুলি দিয়ে অপরের সেবা করতে হবে, অপরের কল্যাণ করতে হবে। গীতার তাৎপর্যে সকলের কল্যাণ আছে আর সকলের কল্যাণের মধ্যে আমাদের কল্যাণ নিহিত। যে লোকেদের খাদ্য বিতরণ করে সে কি অভুক্ত থাকে ? সে কি খাদ্য পায় না ? তেমনই যে সকলের হিত-কর্মে নিযুক্ত তার নিজের হিত হবে না ? তার হিত নিজে থেকেই হয়ে যাবে।

ধনীই হোক আর গরিবই হোক, বড় পরিবারের হোক অথবা একলা, বলবান হোক কিংবা দুর্বল, বিদ্বানই হোক অথবা মূর্খ—কল্যাণে সকলেই সমান অধিকারী। যেমন কোনো মায়ের যদি দশটি ছেলে থাকে তাহলে মা কি দশ টুকরো হয়ে যান ? মা তো সকলের কাছে পূর্ণ। দশটি ছেলেই মাকে তাদের নিজের বলে মনে করে। এইরকম ভগবান পূর্ণত আমাদের,

ভগবানের অংশ হয় না। আমরা সকলে তাঁর কোলে বসবার সমান অধিকারী। সেজন্য আমরা যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ থাকি এবং একে অপরের কল্যাণ করি। এইটিই হল গীতার সিদ্ধান্ত—

'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ', 'সর্বভূতহিতে রতাঃ'।

প্রশ্ন—দান করায়, সেবা করায় কি পাত্র-অপাত্র বিচার করা উচিত ?

উত্তর—অন্ন, জল, বস্ত্র এবং ঔষধ—এগুলি দিতে পাত্র-অপাত্র বিচার করা উচিত নয়। যার অন্ন, জল প্রভৃতির প্রয়োজন সেই পাত্র। কিন্তু যদি কন্যাদান, ভূমিদান, গোদান প্রভৃতি বিশেষ দান করতে হয় তাহলে তার জন্য দেশ, কাল, পাত্র প্রভৃতি বিশেষ বিচার করতে হয়।

অন্ন, জল, বস্ত্র এবং ঔষধ—এগুলি দিতে যদি পাত্র-কুপাত্রের বেশি বিচার করি তাহলে আমরা নিজেরাই কুপাত্র হয়ে যাব এবং দান করা কঠিন হয়ে যাবে। অতএব যদি কোনো ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত প্রভৃতিকে আমরা দেখতে পাই তাহলে আমাদের উচিত তাকে অন্ন, জল প্রভৃতি দেওয়া। সে যদি অপাত্র হয় তাহলেও তাতে আমাদের পাপ হবে না।

প্রশ্ন—অপরকে দিলে গ্রহীতার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে, পাওয়ার লোভ বেড়ে যাবে। অতএব দিয়ে কী লাভ ?

উত্তর—অপরকে বেঁচে থাকার জন্য দেবেন, সঞ্চয় করার জন্য দেবেন না। অর্থাৎ ততটুকুই দেবেন যার দ্বারা তার জীবন নির্বাহ হবে। যদি গ্রহীতার অভ্যাস বিগড়ে যায় তবে তার জন্য বাস্তবে দোষ হল দাতার। অর্থাৎ দাতা, কামনা, মমতা, স্বার্থ প্রভৃতি নিয়ে দান করেছেন ! যদি দাতা নিঃস্বার্থভাবে, প্রত্যাশা না নিয়ে দান করেন তাহলে যাকে দেওয়া হবে তার স্বভাবও দাতার মতো হয়ে থাকে, সেও সেবক হয়ে যাবে। রামায়ণে আছে—

সর্বস দান দীন্হ সব কাহূ। জেহিঁ পাবা রাখা নহিঁ তাহূ॥

(রামচরিতমানস, বালকাণ্ড ১৯৪।৪)

গীতার অনাসক্তি যোগ

'যোগ' শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে। ব্যাকরণের দৃষ্টিতে 'যোগ' শব্দটির উৎপত্তি তিনটি ধাতু থেকে—

(১) **'যুজির্ যোগে'**—সম্বন্ধ অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ।

(২) **'যুজ্ সমাধৌ'**—সমাধিতে স্থিতি।

(৩) **'যুজ্ সংযমনে'**—সংযমন অর্থাৎ সামর্থ্য, প্রভাব।

এইপ্রকার 'যোগ' শব্দের ভেতর সম্বন্ধ, সমাধি (একাগ্রতা) এবং সামর্থ্য—তিনটি কথা আছে। যদিও গীতার 'যোগ' উপরোক্ত তিনটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, তবু প্রধানত ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ (নিত্য যোগ) অর্থেই সেটি প্রযুক্ত হয়েছে—

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোসংজ্ঞিতম্। (৬।২৩)

'যাতে দুঃখের সংযোগের বিয়োগ হয় তাকে যোগ নামে জানা চাই।'

সংসারে যত সম্বন্ধ আছে সেই সবগুলিরই বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। সংসারের সব সংযোগেরই বিয়োগ হবে। এখন যাকে সংযোগ বলে দৃষ্ট হয় তা অতীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না, মধ্যবর্তী সময়েই সংযোগ বলে দৃষ্ট হয়। এতে সংযোগ অনিত্য আর বিয়োগ নিত্য। সংসারের সঙ্গে বিয়োগ নিত্য আর পরমাত্মার সঙ্গে যোগ নিত্য। অতএব সংসারের সঙ্গে বিয়োগই হল পরমাত্মার সঙ্গে যোগ এবং পরমাত্মার সঙ্গে যোগই হল সংসারের সঙ্গে বিয়োগ। আমরা মানি বা নাই মানি, স্বীকার করি বা নাই করে, দৃষ্টি দিই বা নাই দিই ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নিত্য। আমাদের সেই নিত্য সম্বন্ধের অনুভূতি কেন হচ্ছে না ? তার কারণ যার সঙ্গে আমাদের নিত্য বিয়োগ, আমাদের আসক্তি তার প্রতি। আমরা

জানি যে শরীর, ধনসম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন, আদর-আপ্যায়ন, মান-অপমান প্রভৃতি কিছুই থাকবে না, সবই চলে যাবে, এগুলির বিচ্ছেদ নিশ্চিত। তাহলেও ভুলবশত আমরা এই জিনিসগুলির প্রতি প্রিয়তা সৃষ্টি করি অর্থাৎ এগুলির প্রতি আসক্ত হই, যেন এগুলির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নিত্য স্থাপিত থাকে। যদি এই জিনিসগুলির প্রতি অনাসক্তি হয়ে যায় তাহলে যোগের সঙ্গে অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের নিত্যসম্বন্ধ অনুভূত হবে। সেই পরমাত্মার সঙ্গে কোনো জীবের কখনো সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়নি, বিচ্ছেদ নেই, বিচ্ছেদ হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। তাহলে 'অনাসক্তি যোগ'-এর অর্থ হল যার সঙ্গে আমাদের কখনো সংযোগ হয়নি, সংযোগ নেই, সংযোগ হবে না, হওয়া সম্ভব নয় সেই সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে যোগ (পরমাত্মার নিত্য সম্বন্ধ)-কে অনুভব করা। গীতায় আছে—

আসক্তি দূর হলে সংসারের অ-ভাব (নিত্যবিয়োগের) এবং পরমাত্মার ভাব (নিত্যযোগের)-এর অনুভূতি হয়ে যাবে।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ। (২।১৬)

'অ-সতের ভাব (সত্তা) বিদ্যমান নেই এবং সতের অ-ভাব বিদ্যমান নেই।'

তাৎপর্য হল অ-সৎ বস্তুর অবিদ্যমানতা নিত্য এবং সৎ বস্তুর ভাব নিত্য। এখন সংসারের সঙ্গে সংযোগ যদি দেখা যায়ও অন্তিমে তা বিয়োগেই পরিণত হবে। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে বিয়োগ দৃষ্ট হলেও তাঁর সঙ্গে নিত্যযোগ থাকে। বিনাশশীল বস্তুর সঙ্গে মেনে নেওয়া যে সংযোগ তা যেন থেকে যায় এই ইচ্ছাই নিত্যযোগের অনুভূতির ক্ষেত্রে মূল বাধা।

ভেবে দেখুন, এক সময় আমরা নিজেদের বালক বলতাম। কিন্তু সেই বালক অবস্থার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। বিচ্ছেদ আমরা করিনি। একথা কেউ বলতে পারে না যে অমুক তারিখে আমরা বালক অবস্থা ত্যাগ করেছি। যেমন স্বাভাবিকভাবে বালক অবস্থার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে তেমনই যুবাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থার বিচ্ছেদও স্বাভাবিকভাবে হয়ে যাবে।

এইভাবেই প্রতি মুহূর্তে দেশ, কাল, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনার বিচ্ছেদ হচ্ছে। কিন্তু আসক্তির দরুন এগুলির সঙ্গে সংযোগ দৃষ্ট হয়।

যেগুলির সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী সেগুলিকেই আমরা নিজেদের বলে মেনে নিই, সেগুলি থেকে সুখ পেতে চাই। তাতেই আমাদের মন আটকে থাকে, সেগুলিকে আমরা চিরকাল রেখে দিতে চাই, সেগুলির প্রতি আমাদের প্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলিতে আমাদের মন আকৃষ্ট হয়—একেই 'আসক্তি' বলে। এই আসক্তিই যখন ভগবানের প্রতি হয় তখন তাকে 'প্রেম' বলা হয়। আসক্তি হলে সংসারকে নিত্য মনে হয় আর প্রেম হলে ভগবান নিত্য দৃষ্ট হন। আজকাল লোকেরা সংসারের প্রতি আসক্তিকে 'প্রেম' নাম দিয়েছে। এটি খুবই ভুল। প্রেম সব সময় অবিনাশীর প্রতি হয়, বিনাশশীলের প্রতি হয় না।

শরীর, আত্মীয়, অবস্থা, ঘটনা, পরিস্থিতি প্রভৃতির সঙ্গে আমরা নিজেদের যে সম্বন্ধ মেনে নিই সেই সম্বন্ধ আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না এবং বর্তমানেও তার সঙ্গে নিরন্তর বিচ্ছেদ হচ্ছে। এই নিরন্তর বিচ্ছেদে কখনো ছেদ পড়ে না, এর বিরতি নেই। এর অনধ্যায় হয় না। এতে বিশ্রাম নেই। এরকম হতে থাকলেও এগুলির সঙ্গে সংযোগ দৃষ্ট হয়—এটিই হল আসক্তি। এই আসক্তিই হল বন্ধনকারী—

কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু॥ (গীতা ১৩।২১)

'মানুষের উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মানোর কারণ হল গুণের সঙ্গ।'

তাৎপর্য হল গুণের সঙ্গ, আসক্তি, প্রিয়তাই আমাদের বেঁধে ফেলে, পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ অনুভব করায়।

আমরা আসক্তির সুখ এবং দুঃখ, অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা—দুটিকেই আলাদা আলাদা ভাবে দেখি। আসক্তি দূর হলে দুটিই সমান হয়ে যায়, কেননা সুখ থেকে যাওয়ার জিনিস নয়, দুঃখও থেকে যাওয়ার জিনিস নয় অর্থাৎ কোনো সুখই টেঁকে না আবার দুঃখও টেঁকে না। সুখ যখন আসে তখন ভালো লাগে, যখন চলে যায় তখন খারাপ লাগে। আর

দুঃখ যখন আসে তখন খারাপ লাগে এবং যখন চলে যায় তখন ভালো লাগে। অতএব উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একটি শ্লোক আছে—

শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো।
উভয়োর্দুঃখদায়িত্বে কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ ॥

'শত্রু সংযোগে দুঃখ দেয় আর মিত্র বিয়োগে দুঃখ দেয়। উভয়েই দুঃখদায়ী, তাহলে উভয়ের মধ্যে ভেদ কোথায় ?'

আসক্তিই এই দুটির মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে। অনাসক্ত হলেই ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধের অনুভূতি স্বতই হয়ে যায় আর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হলে আসক্তি দূর হয়। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ আসক্তিকে দূর করে আর আসক্তি দূর হলে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে যায়। ভক্তিযোগ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করে আর সম্বন্ধ যুক্ত হলে সংসারের প্রতি আসক্তি দূর হয়ে যায়। এইজন্য গীতা যোগের দুটি পরিভাষা দিয়েছে— **'দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্'** (৬।২৩) এবং **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (২।৪৮)।[১] তাৎপর্য হল সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদের নামও যোগ এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগের নামও যোগ। সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ সদাসর্বদা থাকে এবং পরমাত্মার সঙ্গে যোগও সদাসর্বদা থাকে। যা সদাসর্বদা থাকে তাকেই 'সমতা' বলা হয়। এই সমতাই হল পরমাত্মার স্বরূপ— **'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'** (গীতা ৫।১৯)। সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর পরমাত্মার সঙ্গে যোগ অনুভূত হয় এবং পরমাত্মার সঙ্গে যোগ অনুভূত হলে সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

ভেবে দেখলে দুটি জিনিস চোখে পড়ে—নিত্য এবং অনিত্য। চিন্তা করে দেখুন, যে আমি বাল্যাবস্থায় ছিলাম সেই আমি আজও আছি, কিন্তু সেই শরীর নেই, সেই স্থান, সেই সময়, সেই সঙ্গী, সেই অবস্থা, সেই পরিস্থিতি, সেই ভাব কিছুই নেই। সবগুলির সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। গঙ্গার জল যেমন নিত্য প্রবাহিত হয় তেমনই সংসারও নিত্য বয়ে চলে,

[১] 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' (গীতা ২।৫০)—এটি যোগের মহিমা, পরিভাষা নয়।

এক মুহূর্তও স্থির থাকে না। তা প্রতি মুহূর্তে অবিদ্যমানতার (বিনাশের) দিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের বয়স যত বছর ততগুলি বছর বিগত হয়েছে। শরীরকে নিয়ে আমরা বলে থাকি যে আমরা বেঁচে আছি—এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সত্য কথা হল, আমরা প্রতিনিয়ত মরছি। আমরা বলি আমাদের বয়স পঞ্চাশ বছর। তার মানে আমাদের বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। আর কত বছর বাকি তা তো জানা নেই। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের মৃত্যু যে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখন জন্মদিন হয় তখন আমরা খুব আনন্দ করি যে আজ আমরা এত বছরের হয়েছি। বাস্তবে এত বছরের হইনি। এত বছরের মৃত্যু হয়েছে। তাৎপর্য হল শরীর এবং সংসারের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ নিত্য-নিরন্তর হয়ে চলেছে। এই বিচ্ছেদকে যদি আমরা অনুভব করি তাহলে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য যোগের অনুভূতি হয়ে যাবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। আপনাদের ঘরে ছেলেও জন্মায়, মেয়েও জন্মায়। আপনাদের মনে তো এই ভাব থাকে যে ছেলে তো থেকে যাবে আর মেয়ে যাবে চলে। সেজন্য ছেলের প্রতি আপনাদের যত আসক্তি মেয়ের প্রতি তত নয়। মেয়ে তো ঘরে থাকবে না, এই দৃঢ় নিশ্চয় থাকায় মেয়ের প্রতি ততটা মোহ থাকে না। এই রকম, শরীর, ধন-সম্পত্তি, আদর-আপ্যায়ন, মান-সম্মান প্রভৃতি সব কিছু হল মেয়ে, এরা আপনাদের কাছে থাকার নয়। সমগ্র সংসার সব সময় আপনাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এই আলাদা হয়ে যাওয়া কখনো বন্ধ হয় না। অন্তিমে সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এটি অকাট্য কথা। ব্রহ্মার চেয়েও বেশি আয়ু যদি কেউ পেয়েও যায় তাহলেও সংসারের সঙ্গে তার সংযোগ কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না। এই অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও আসক্তির দরুন সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির প্রতীত হয়। এই আসক্তি দূর করাই মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং এতেই মনুষ্য জীবনের সফলতা। কেননা অন্য কোনো জন্মে এই রকম বিবেক থাকা সম্ভব নয়।

মনের মধ্যে বস্তুসামগ্রীগুলিকে নিজেদের বলে মেনে নেওয়াই হল মমতা (আসক্তি)। বাইরে অর্থাৎ আচরণের ক্ষেত্রে সেগুলিকে নিজের মনের করা

আসক্তি নয়। আচরণে নিজস্বতার সম্বন্ধ কেবল সেবা করার জন্যই থাকা উচিত। পরস্পরকে সেবা করার জন্য যে সম্বন্ধ সৃষ্টি হয় তা বন্ধনকারী নয়। নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য যে সম্বন্ধ মেনে নেওয়া হয় সেটিই বন্ধনকারী।

সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ টিকতে পারে না আর পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ দূর হয় না। কিন্তু বিনাশশীল বস্তুর প্রতি আসক্তির কারণে পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের আভাস আমরা পাই না। বিনাশশীল বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকায় কেবল সেগুলির প্রতিই আমাদের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন—বিনাশশীল বস্তুর প্রতি আসক্তি কী করে দূর হবে ?

উত্তর—এর সহজ উপায় হল যাদের প্রতি আমাদের আসক্তি তাদের আমরা সেবা করব এবং পরিবর্তে মান-সম্মান, সেবা, আপ্যায়ন, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কিছুই চাইব না। যেসব লোকের প্রতি আত্মীয়তা আছে তাদের আমরা সেবা করব। যেসব বস্তুর উপর নিজস্বতাবোধ আছে সেগুলিকে আমরা সেবার কাজে লাগাব। শরীরের প্রতি যদি নিজত্ব বোধ থাকে তাহলে শারীরিক পরিশ্রম করে সেবা করব। অপরের সুখবিধানের মনোভাব যেমন যেমন সৃষ্টি হবে বস্তু সামগ্রীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদও তেমনভাবে হয়ে যাবে।

মলমাসের সময় মা-বোনেরা দান করার জন্য থালা, বাটি, গেলাস, ঘটি, ছাতা, আসন, বস্ত্রাদি বস্তু একত্র করেন। সেগুলি থেকে একটি বাটিও যদি কোনো ছেলে নিয়ে যায় তো তাঁরা বলেন, আরে, এটা দানের জিনিস। এটা আমাদের নয়। আমাদেরই পয়সায় কেনা এবং আমাদেরই ঘরে রাখা জিনিসকে আমরা নিজেদের বলে মনে করি না। এইভাবেই এই সব জিনিসই হল সেবার জন্য, নিজেদের সুখভোগের জন্য নয়। এটি যদি নিশ্চিত করে নেন তাহলে এই বিষয়ে আসক্তি দূর হয়ে যাবে।

এই মনুষ্যশরীর সুখভোগের জন্য নয়—**'এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাঈ।'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৪।১)। এই শরীর অপরের সুখবিধানের জন্য, অপরের সেবা করার জন্য। যদি আমরা সেবায় লেগে যাই, সকল প্রাণীর হিতসাধনে আমাদের প্রীতি হয়ে যায় তাহলে আসক্তি দূর হয়ে

যাবে—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ১২।৪)।

সিদ্ধান্ত হল এই যে, যা আদিতে থাকে এবং অন্তিমে থাকে তা বর্তমানেও আছে।[১] আর যা আদিতেও ছিল না এবং অন্তিমেও থাকবে না তা বর্তমানেও নেই।[২]

যদি এখন আমার বয়স আশি-নব্বই বছর হয়ে থাকে তাহলে নব্বই বছর আগে এই শরীর, ঘর, আত্মীয়, সম্পদ আমার ছিল না এবং আশি-নব্বই বছর পরে সেগুলি আমার থাকবে না। সুতরাং বর্তমানেও এগুলি আমার নয়। এগুলি থেকে নিরন্তর বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আগেও ছিল, পরেও থাকবে এবং বর্তমানেও আছে। তাৎপর্য হল পরমাত্মার অংশ হওয়ায় তাঁর সঙ্গে আমাদের নিত্য যোগ। সুখের আশায় আমরা বিনাশশীল বস্তুর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ জুড়ে নিই—এরই নাম আসক্তি। আমাদের সুখ পেতে হবে না, বরং সুখ দিতে হবে। যদি আমরা কেবল অপরের সুখ বিধানে, অপরের কল্যাণ সাধনে, অপরের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করি তাহলে আমাদের আসক্তি দূর হবে। কিন্তু ভুল হল এই যে আমরা অপরকে সুখ দিই নিজেদের সুখ পাওয়ার জন্য। ব্যবসায়ী যেমন লাভের জন্য জিনিস কেনেন এবং লাভের জন্যই জিনিস বিক্রি করেন ঠিক তেমনভাবেই আমরা নিজেদের সুখের জন্য অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করি। এইভাবে আমরা নিজেদের সুখকেই

---

[১] আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৮।১৮)

'এই সংসারের আদিতে যা ছিল এবং যা অন্তিমে থাকবে, যা এর মূল কারণ এবং প্রকাশক সেই পরমাত্মা মধ্যেও বর্তমান আছেন।'

'যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যং চ তস্য সন্।' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৫।২৭)

'যা আদি এবং অন্তিমে আছে, তা মধ্যকালেও আছে এবং সেইটিই সত্য।'

[২] 'ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চন্মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।'

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৮।২১)

'যা সৃষ্টির প্রথমে ছিল না এবং প্রলয়ের পরেও থাকবে না তা মধ্যেও নেই বলে বুঝে নিতে হবে—তা কল্পনামাত্র, নামমাত্র।'

ধরে রেখেছি। এইটিই হল আসক্তি।

আমাদের বিনাশী সুখ নেওয়ার দরকার নেই। আমাদের দরকার অবিনাশী সুখ। এই অবিনাশী সুখ (আনন্দ) নিত্যপ্রাপ্ত। যেমন, পৃথিবীতে রাত এবং দিন দুটিই হয়, কিন্তু সূর্যে না আছে রাত, না আছে রাতের সঙ্গে থাকা দিন, সেখানে সব সময়েই দিন (প্রকাশ)। তেমনই সংসারে সুখ এবং দুঃখ দুটিই হয়। কিন্তু পরমাত্মায় না আছে সুখ এবং না আছে দুঃখ, সেখানে কেবল নিত্য সুখ (আনন্দ)।

রাম সচ্চিদানন্দ দিনেসা। নহিঁ তহঁ মোহ নিসা লবলেসা।।

(শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৬।৩)

বস্তুগুলিকে ত্যাগ করতে হবে না, সেগুলি থেকে সুখ নেওয়ার আশা, কামনা এবং ভোগকেই ত্যাগ করতে হবে। শরীরকে ত্যাগ করলে তো মৃত্যু হবে, তাই শরীরের দ্বারা সুখ নেওয়ার ইচ্ছা, তাকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছাকেই ত্যাগ করতে হবে। এইভাবে বস্তু থেকে, ব্যক্তি থেকে সুখ নেওয়ার ইচ্ছাকেই ত্যাগ করতে হবে। যেমন শীতের সময় বালাপোষ ইত্যাদি সুখের জন্য নেওয়া হয় না, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যই নেওয়া হয়। ওই ধরনের বালাপোষ চাই, ওই ধরনের কম্বল চাই—এইটিই হল আসক্তি। কিন্তু বালাপোষ ভালো হোক বা মন্দ হোক, কম্বল হোক বা চট হোক—আমাদের তো শীত নিবারণ করতে হবে—এটি আসক্তি নয়, এ হল প্রয়োজন। আসক্তি এবং আবশ্যকতা দুটি ভিন্ন জিনিস। সংসারের প্রতি আসক্তি অথবা কামনা হয় আর পরমাত্মার জন্য প্রিয়তা অথবা প্রয়োজনীয়তা হয়। প্রয়োজনের পূর্তি হয় এবং কামনা দূরীভূত হয়, যা দূর হবেই তাকে ত্যাগ করতে বাধা কোথায় ?

শিশু জন্মগ্রহণ করে, সে বড় হবে কিনা, পড়াশোনা করবে কি না, তার বিবাহ, সন্তান-সন্ততি হবে কিনা, তার কাছে অর্থ থাকবে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু সে মারা যাবে কিনা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে অবশ্যই মারা যাবে। আমরা যদি সন্দেহাতীত বিষয়কে ধারণ না করি তাহলে আর কোন জিনিসকে ধারণ করব ? সন্দেহাতীত বিষয়কে ধারণ করলে আমাদের দুঃখে পড়তে হবে না।

অতএব যার সঙ্গে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী তার বিচ্ছেদকে এখনই মেনে নিন। যার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবেই তার কাছে থেকে সুখ লাভের ইচ্ছা কেন করবেন ? তার কাছ থেকে সুখ লাভের ইচ্ছা যদি করেন তাহলে তার সঙ্গে আপনাদের বিচ্ছেদ হলে কাঁদতে হবে। যদি প্রথম থেকেই সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করেন তাহলে আর কাঁদতে হবে না।

মেয়ে যখন বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যায় তখন সে কাঁদে। মা-বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হওয়ায় তার দুঃখ হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সে যখন সেখানে বসবাস করতে থাকে এবং মিলেমিশে যায় তখন সে তার পিত্রালয়কে ভুলে যায়। যখন সে পিতামহী-প্রপিতামহী হয় আর তার পৌত্র-প্রপৌত্রদের স্ত্রী উৎপাত করে তখন সে বলে এই পরের ঘরের মেয়ে আমার সংসার বরবাদ করে দিল। তার মনেই থাকে না যে সেও একদিন পরের ঘরের মেয়ে ছিল। একেই আসক্তি বলে। সে এই ঘরকে নিজের বলে মেনে নিয়েছে—আমি মা এরা আমার ছেলে, আমি ঠাকুমা এ আমার নাতি, আমি প্রপিতামহী এ আমার প্রপৌত্র এরা সবাই আমার। এতে এক প্রকারের রস (সুখ) পাওয়া যায়। এই রসই (সুখানুভূতি) ভীষণ দুঃখদায়ী হবে। এই রস তো চিরকাল থাকবে না। নষ্ট হয়ে যাবে, যদি সুখ দেবার জন্য সম্বন্ধ গড়া হয় তাহলে চিরকালের জন্য সুখী হয়ে যাবেন। সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি কোনো মেলা-উৎসবে সেবা করবার জন্য যায়, কিন্তু লোকেদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে তাদের কাঁদতে হয় না। তার কারণ তারা অন্যকে সুখ দেবার জন্য সেখানে গিয়েছিল, সুখ নেবার জন্য যায়নি। কিন্তু যে পরিবারে আমরা থাকি সেখানে অপরের কাছ থেকে সুখ পাওয়ার আশা আমাদের থাকে। তাই তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে আমাদের কাঁদতে হয়।

কারও ছেলে মারা গেলে খুব দুঃখ হয়। কিন্তু বাস্তবে ছেলের মৃত্যুতে দুঃখ হয় না। তাকে নিজের বলে মনে করার জন্যই দুঃখ হয়। প্রতিদিন পৃথিবীতে কত ছেলে মারা যায়, কেননা যারা মারা যায় তারা তো কারো না কারো ছেলে, তাদের সকলের জন্য দুঃখ হয় না। কিন্তু 'আমার ছেলে' বলে যাকে মেনেছেন তার মৃত্যুতেই দুঃখ হয়। সুতরাং সংসারে নিজের

বলে যে সম্বন্ধ তাই দুঃখ দিয়ে থাকে। কিন্তু যদি সেবা করবার জন্য সম্বন্ধ গড়ে তোলা হয় তাহলে আর দুঃখ হবে না। এইজন্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সকলের সেবা করা, সকলকে সুখপ্রদান করার সম্বন্ধই গড়ে তোলা উচিত। এরকম করলে আসক্তি দূর হয়ে যাবে।

যদি পঁচিশ বছরের ছেলে মারা যায় তাহলে খুবই দুঃখ হয়। কিন্তু সেই ছেলে যদি উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ডাক্তাররা বলে দেন যে এর বাঁচার সম্ভাবনা নেই এবং ছেলে যদি রোগে ভুগে ভুগে পঁচিশ বছর বয়সেই মারা যায় তাহলে ততটা দুঃখ হয় না। তাৎপর্য হল এই যে সুখের আশা, কামনা এবং ভোগের মধ্যেই দুঃখ নিহিত। যদি সুখের আশা, কামনা এবং ভোগাকাঙ্ক্ষা না করেন তাহলে দুঃখ হতেই পারে না। সকল দুঃখ সুখের আশা, কামনা এবং ভোগের উপর অবলম্বিত।

যে নেওয়ার উদ্দেশ্যে দেয় বাস্তবে সে নেয়ই, দেয় না। যে 'এক গুণ দান আর সহস্র গুণ পুণ্য' এই মনোভাব নিয়ে এক টাকা দান করে তার সম্বন্ধ হাজার হাজার টাকার সঙ্গে জুড়ে যায়। অতএব যে সুখ লাভের আশায় স্ত্রীকে সুখ দেয়, শিশুদের পালন-পোষণ করে, ছেলেদের বিবাহ দেয় তাকে পরিণামে দুঃখ পেতে হয়। যে সুখ পাওয়ার জন্য কারো সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করে না সে সংসারে খুব আনন্দে থাকে। সে আনন্দে বেঁচে থাকে এবং আনন্দে মগ্ন থেকেই মারা যায়। কিন্তু যে পাওয়ার ইচ্ছায় সম্বন্ধ যুক্ত করে থাকে সে জীবিত অবস্থাতেও দুঃখ পায় এবং মরবার সময়েও দুঃখ পায়। ছোট, বড়, সমান যে কোনো অবস্থারই মানুষ হোক সকলকেই সুখ প্রদান করা উচিত। এমন করলে আমাদের আচরণ শুদ্ধ হয়ে যাবে, আমরা শান্তি লাভ করব, না চাইলেও আদর, আপ্যায়ন বেড়ে যাবে। সুতরাং আসক্তি ত্যাগ করবার উপায় হল—সেবা করা, সকলের সুখবিধান করা, কারো সঙ্গে সম্বন্ধ যদি গড়ে তুলতেই হয় তাহলে তাকে সুখ দেওয়ার জন্য, তার হিত সাধনের জন্য, তার কল্যাণ করার জন্য, তাকে আদর-আপ্যায়ন করার জন্য, তাকে আরাম দেওয়ার জন্য সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে, পাওয়ার জন্য যেন সম্বন্ধ জোড়া না হয়। তাতে আসক্তি

দূর হয়ে যাবে।

এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর মহলের ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। পাঁচ-ছ জন লোক তাঁর সঙ্গে ছিল। মহলের পিছনে কয়েকটি বাড়ির ভগ্নাবশেষ ছিল। সেই ভাঙা বাড়িগুলিতে কখনো কখনো একজন সাধু এসে থাকতেন। রাজা সেই ভাঙা বাড়িগুলিকে দেখিয়ে নিজের লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে এক সাধু এসে থাকতেন, তাই না ?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, মহারাজ ! কিন্তু গত কয়েকবছর তাকে আসতে দেখছি না।' রাজা বললেন, 'তিনি খুব ত্যাগী বিরাগী সাধু ছিলেন। তাঁকে দেখলে খুবই শান্তি লাভ হত। তাঁর দেখা পেলে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তার ঠিকানা জোগাড় করুন।' রাজার লোকেরা তাঁর খোঁজ করে জানতে পারল যে তিনি দেহ ত্যাগ করেছেন। মানুষের এই একটি বড় ভুল যে যখন কেউ জীবিত থাকে তখন তার উপস্থিতির লাভ নেয় না, কিন্তু সে যখন মারা যায় তখন আফশোষ করে। রাজা বলেছিলেন, 'আহা ! আমার বড়ই ভুল হয়ে গিয়েছে। তাঁর কাছ থেকে আমার কিছুই পাওয়া হল না ! তাঁর যদি কোনো শিষ্য থাকেন তাঁকেই তাহলে এখন নিয়ে এসো। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।' রাজার লোকেরা খোঁজ করে একজন সাধুর সন্ধান পেল। তারা তাঁকে জিজ্ঞসা করল, 'সাধু-মহারাজ ! আপনি কি সেই সাধুকে জানতেন ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, জানতুম। তিনি খুব উচ্চ কোটির মহাত্মা ছিলেন।' রাজার লোকেরা আবার প্রশ্ন করল 'আপনি কি সেই সাধুর শিষ্য ?' সাধু বলেছিলেন, 'না, তিনি কাউকে শিষ্য করতেন না। তবে হ্যাঁ, আমি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে ছিলুম।' রাজার কাছে এই খবর পৌঁছালে তিনি তাঁকেই নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। রাজার লোকেরা সেই সাধুর কাছে গিয়ে বলল 'সাধু-মহারাজ ! রাজা আপনাকে ডেকেছেন। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।' তিনি বললেন, 'ভাই আমি কী অপরাধ করেছি ?' তার কারণ রাজা সাধারণত যারা কোনো দোষ করে তাদেরই ধরে আনতে বলেন। রাজার লোকেরা বলেছিল 'না সাধু-মহারাজ ! আপনাকে তো তিনি সৎসঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে পারমার্থিক কথা

জিজ্ঞেস করবার জন্য ডেকেছেন। আপনি দয়া করে আমাদের সঙ্গে চলুন।' সেই সাধু 'আচ্ছা' বলে তাদের সঙ্গে চললেন, চলতে চলতে তিনি একটা গলির মধ্যে বসে পড়লেন। রাজার লোকেরা মনে করেছিল যে তিনি বোধ হয় প্রস্রাব করছেন। গলির মধ্যে একটা কুকুরীর কয়েকটা বাচ্চা হয়েছিল। সাধু একটা বাচ্চা উঠিয়ে নিজের চাদরের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে লাগলেন।

রাজার আসরে বসবার স্থানকে (চেয়ারকে) খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়, কাকে কীরকম আসন দেওয়া হবে, কাকে কতটা সম্মান দেওয়া হবে, কাকে উঁচুতে, কাকে নীচে আসন দেওয়া হবে সেদিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। রাজা সাধুকে বসবার জন্য গালচে পেতে দিয়েছিলেন এবং নিজেও তার উপর বসেছিলেন। এতে উঁচু-নিচু আসনের বিভেদ আর থাকেনি। সাধুবাবা সেখানে বসেই রাজার সামনে পা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাজা ভেবেছিলেন, এ লোকটা মূর্খ—এর সভ্যতা-ভব্যতা কিছু জানা নেই। কখনো রাজসভায় আসেনি, তাই রাজার সামনে কী করে বসতে হয় তা জানা নেই। রাজা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কবে থেকে চরণ যুগল ছড়াচ্ছেন, সাধু উত্তর দিয়েছিলেন—যবে থেকে হাত গুটানো হয়েছে। তাৎপর্য হল, কিছু নেওয়ার ইচ্ছা হলে হাত পাততে হয়, পা গোটাতে হয়। কিন্তু আমার কিছুই নেওয়ার নেই। তাই হাত গুটিয়েছি এবং পা ছড়িয়ে দিয়েছি। এই কথা বলে সাধু হাত-পা ঠিক করে নিয়েছিলেন। রাজা উত্তর শুনে বুঝতে পেরেছিলেন যে লোকটি মূর্খ নয়, বরং খুবই বুদ্ধিমান, ত্যাগী এবং চৈতন্যবিশিষ্ট। রাজা সেই সাধুর সম্পর্কে আলোচনা করলে এই সাধুটি বলেছিলেন যে তিনি খুবই বড় মাপের সাধু ছিলেন, সেরকম সাধু কমই হয়ে থাকেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি তো তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাই না ?

সাধু বলেছিলেন—হ্যাঁ, আমি তো তাঁর সঙ্গে ছিলাম।

রাজা—আপনি তো তাঁর কাছ থেকে কিছু নিয়েছেন ?

সাধু—না রাজা ! আমি নিইনি।

রাজা—আপনি কি একেবারেই রিক্ত হয়ে গিয়েছেন ?

সাধু—এমন সন্তের কাছে থাকলে কেউই রিক্ত থাকতে পারে না। আমি তো কিছু নিইনি, তবে কিছু থেকে গিয়েছে।

রাজা—কী থেকেছে ?

সাধু বলেছিলেন—যেমন কৌটো থেকে কস্তুরী বার করে নিলেও তাতে গন্ধ থাকে, ঘি-এর পাত্র থেকে ঘি বার করে নিলে তাতে তেলোভাব থেকে যায় তেমনই সাধু-সন্তের সঙ্গে অবস্থান করলে তাঁদের সৌগন্ধ, ঔজ্জ্বল্য থেকে যায়।

রাজা বলেছিলেন—মহারাজ ! সেই সৌগন্ধ, ঔজ্জ্বল্য কী ? আমাকে বলুন।

সাধু—রাজা ! এ হল আমাদের মতো সাধু-ফকিরদের কথা। রাজাদের বিষয় নয়। আপনি জেনে কী করবেন ?

রাজা—না মহারাজ ! আপনি অবশ্যই বলুন।

সাধু চাদরের ভেতরে লুকানো কুকুর-বাচ্চা বার করে রাজার সামনে রেখে দিলেন।

রাজা—আমি তো বুঝতে পারলাম না।

সাধু—আপনি রাগ করবেন না তো ?

রাজা—আরে আমি তো জিজ্ঞাসাই করছি, রাগ কেন করব ? আপনি সত্য কথাই বলুন।

সাধু বলেছিলেন—রাজা ! আমি আপনার সঙ্গে এই কুকুর-বাচ্চার কোনো প্রভেদ দেখি না। এই সমতাই হল ওই সন্তের সুগন্ধ এবং ঔজ্জ্বল্য। এই কুকুর-বাচ্চাটা খুবই সাধারণ আর আপনি খুবই বিশিষ্ট। এই কথাটি তো ঠিক, কিন্তু আমার সে রকম মনে হয় না। আপনার মধ্যে প্রাণ আছে আর এর মধ্যেও প্রাণ আছে। আপনার মধ্যে শ্বাসক্রিয়া চলে আর এর মধ্যেও তাই। পঞ্চভূত দিয়ে যেমন আপনার শরীর গঠিত, আপনি চক্ষুষ্মান, এও তাই। আপনি খান এও তাই করে। আপনার সঙ্গে এর

তফাৎটা কোথায় ? সংসারের সকল প্রাণীর মধ্যে কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে। কারো মধ্যে এক রকম, অন্যের মধ্যে আর এক রকম। মোটমাট সকলে সমান। আপনি উচ্চ পদাসীন আর এ নীচে অবস্থিত—এই প্রভেদ তখনই হয় যখন আমার কোনো স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে। আমার কারো সঙ্গে কোনো রকম স্বার্থের সম্বন্ধ নেই—আপনার কাছ থেকেও কিছু পাওয়ার নেই, কুকুরের কাছ থেকেও কিছু নেওয়ার নেই। তাহলে আমার কাছে আপনার সঙ্গে এর প্রভেদ কোথায় ? আপনি রাগ করবেন না। আপনি জানতে চেয়েছিলেন তাই সোজাসুজি জানিয়ে দিলুম। আমি আপনাকে ছোট করছি না, বরং আপ্যায়নই করছি। কেননা আপনি হলেন প্রজাদের মালিক।

তাৎপর্য হল এই যে, সংসার থেকে যখন আমাদের কিছু নিতে হয় তখন আমরা কাউকে ধনী, কাউকে দরিদ্র দেখি। ধনী বা দরিদ্র কারো কাছ থেকেই যখন আমাদের কিছু নেওয়ার নেই তখন আমাদের কাছে তাদের প্রভেদ কোথায় ? একজন সাধু ছিলেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করে সেখানে বসেই খাওয়া—এই ছিল তাঁর প্রতিদিনের নিয়ম। শহরে ভিক্ষা নেওয়ার সময় রাস্তায় খুব ভিড় থাকত। তাই স্পর্শদোষ থেকে বাঁচবার জন্য তিনি সেখানে বসেই খেয়ে নিতেন। একদিন খেয়ে নেওয়ার পর তিনি যখন তাঁর বাসন মাজছিলেন তখন এক ধনী ব্যক্তি বলেছিলেন, দিন আপনার পাত্রটা আমি মেজে দিই। সাধু বলেছিলেন আপনাকে দিয়ে মাজাতে পারি না। তখন তিনি বলেছিলেন যে তাঁর চাকর মেজে দেবে। সাধু বলেছিলেন 'আমার কাছে আপনার আর আপনার চাকরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আপনি মাজুন আর চাকরই মাজুন তাতে তফাৎটা কোথায় ?' প্রভেদ তখনই হবে যখন আমি আপনাকে বড় মনে করব আর চাকরকে মামুলী বলে মনে করব। আমার কাছে আপনি যেমন সম্মানীয় চাকরও তেমনই সম্মানীয় এবং চাকর যেমন আমার কাছে শ্রদ্ধেয় আপনিও তেমনই আমার কাছে শ্রদ্ধেয়, চাকর তো আপনার, আমার তো নয়। তাকে কি আমি মাইনে দিই ? আপনার সঙ্গে এবং আপনার চাকরের

সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো একই রকম। ভিন্নতা তো তখনই হবে যখন আমার কিছু পাওয়ার থাকবে, যখন রাগদ্বেষপূর্বক কোনো সম্বন্ধ আমার যুক্ত করার থাকবে !'

তাৎপর্য হল, সংসার থেকে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলে আসক্তি দূর হয়, অতএব কেবল দেওয়ার জন্য, সুখবিধানের জন্য সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রাখুন—আসক্তি দূর করবার এইটিই সহজ সরল উপায়। স্ত্রী, পুত্র, মা-বাবা, ভাই-বৌদি প্রভৃতি সকলের সুখবিধান করতে হবে। হিত-সাধন করতে হবে, এবং তাদের কাছ থেকে কিছুই নিতে হবে না। তাঁদের সঙ্গে আমাদের নিজস্বতা আগেও ছিল না এবং পরেও থাকবে না, কেবল মধ্যকালেই নিজের বলে মেনে নিয়েছি। আর তাও নিরন্তর শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটি ছাড়াবার দায় আমাদের। কেননা আসক্তি আমরাই ধরে রেখেছি। তা ভগবানের বা অন্য কারো দেওয়া নয়। এটি কর্মফলও নয়, এ হল আমাদের মূর্খতার ফল। নিজের মূর্খতা ত্যাগ করা নিজেদেরই কর্তব্য।

সাংসারিক ভোগস্পৃহা এবং সংগ্রহের আসক্তির জন্য পরমাত্মা প্রাপ্তির যে অনন্ত আনন্দ তার অনুভূতি হচ্ছে না। তাই আসক্তি ত্যাগ করতে হবে এবং পরমাত্মার প্রেম লাভ করতে হবে। কারণ আমরা স্বরূপত পরমাত্মার অংশ, তাই আমাদের আকর্ষণ পরমাত্মার দিকেই হওয়া উচিত, শরীর অথবা সংসারের দিকে হওয়া উচিত নয়। আমরা যদি কেবল শরীরের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ মেনে নিই তাহলে সমগ্র সংসারের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ জুড়ে যাবে। যেমন, যখন কোনো পুরুষের কোনো নারীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তৈরি করে তখন সেই লোকের শ্বশুর-শাশুড়ি, শালা-শালি প্রভৃতি সকলের সঙ্গেও তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় আর যদি স্ত্রী মারা যায় তাহলে কেউ আর শ্বশুর-শাশুড়ি, শালা-শালি থাকে না। ঠিক তেমনই কেবল শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়লে সমগ্র সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ জুড়ে যায়। আর শুধু শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করলেই সমগ্র সংসারের সঙ্গেই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল, নেওয়ার ইচ্ছা থেকে সমগ্র সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে আর নেওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলে সমগ্র সংসারের সঙ্গেই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ

হলেই পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ (নিত্যযোগ)-এর অনুভূতি হয়ে যায়। এইটিই হল অনাসক্তি যোগ।

প্রশ্ন—আমরা যার সেবা করব তার প্রতি কি আমাদের আসক্তি হয়ে যাবে না ?

উত্তর—হবে না। একজন লোক জলসত্রে বসে লোকদের জল খাওয়ায়। তাতে অনেকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। কিছু লোক আসে এবং জল খেয়ে চলে যায়। কিন্তু জলসত্রে বসে থাকা লোকটির তাদের প্রতি কোনো আসক্তি থাকে না। কেননা জল দেওয়া ছাড়া তাদের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধই নেই। আসক্তি তো নেওয়ার সম্বন্ধ থেকেই সৃষ্টি হয়।

কোনো লোক শীতের সময় পঞ্চাশটি কম্বল বিতরণ করলে তার খুব মহিমা প্রচারিত হয়। কিন্তু কোনো ব্যবসায়ী যখন পঞ্চাশটা কম্বল বিক্রি করেন তখন তাঁর কোনো মহিমা হয় না। ব্যবসায়ীর বিক্রি করা কম্বলেও শীত দূর হয়, কিন্তু তাতে তাঁর কোনো পুণ্য হয় না। কেননা তিনি পয়সা রোজগার করবার জন্য কম্বল বিক্রি করেছেন। নেওয়ার জন্য দেওয়া আসলে দেওয়া নয়, প্রত্যুত তা নেওয়াই। সুতরাং আসক্তি সেখানেই হয় যেখানে নেওয়ার জন্য দেওয়া হয় অথবা নেওয়ার জন্যই নেওয়া হয় অর্থাৎ যেখানে নেওয়াটাই প্রধান। সুতরাং দেওয়ার জন্য নেওয়া উচিত এবং দেওয়ার জন্যই দেওয়া উচিত। যেমন, কোনো ব্রাহ্মণ যখন শ্রাদ্ধাদিতে কেবল যজমানের হিতের জন্য কিছু নেন তখন তিনি দেওয়ার জন্যই নিয়ে থাকেন।

প্রথমে উদ্দেশ্য সৃষ্টি হয় তারপর কর্ম করা হয়। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আসক্তি ত্যাগ করা। আসক্তি ত্যাগ করবার জন্যই আমাদের নিতে হবে এবং আসক্তি ত্যাগ করবার জন্যই আমাদের দিতেও হবে। কারো কাছে কোনো আশা রাখা উচিত নয়। স্ত্রী যদি রান্না তৈরি করে দেন তো খাবেন, কিন্তু তিনি প্রতিদিন রান্না তৈরি করে দেবেন এমন আশা করবেন না। আশাই পরম দুঃখ দেয়—**'আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৮।৪৪)।

নিজেদের শক্তি অনুসারে অপরের সেবা করা উচিত। আমাদের কাছে

যতটা সময়, যতটা জ্ঞান, যত সামর্থ্য, যত সামগ্রী তার দ্বারাই অপরের সেবা করতে হবে। আমাদের দায়িত্ব এর বেশি নয়। আর অন্যেও তার বেশি আমাদের কাছে আশা করে না। মাল বিক্রয়ের ওপর বিক্রয় কর আর আয়ের ওপর আয়কর বসান হয়। মাল না থাকলে কর কীসের ? আর আয় না থাকলে করই বা কীসের ?

প্রশ্ন—সৎসঙ্গ প্রভৃতিতে আসক্তি থাকাও কি দোষ ?

উত্তর—না, কেননা এ আসক্তি নয়, এ হল প্রেম। কামনা নয়, প্রত্যুত তা হল প্রয়োজন। কিন্তু ভালো গান-বাজনা, ভালো রাগ-রাগিনী, খুব শ্রুতিমধুর ভাষণ যা শ্রোতাদের কাঁদায় বা হাসায়—এ হল শ্রোতাদের আসক্তি। লোকেরা আমাদের বক্তা বলে মনে করবে, আমাদের সম্মান করবে—এ হল বক্তার আসক্তি। মুক্তির জন্য, তত্ত্ববোধের জন্য, ভগবৎ-প্রেমের জন্য সৎসঙ্গ প্রভৃতিতে রুচি তো বাস্তবে আমাদের আবশ্যকতা (ক্ষুধা), এটি দোষের নয়।

সৎসঙ্গ আসক্তি দূর করার জন্য। কাঁটা দিয়ে যেমন কাঁটা তোলা, তেমনই সৎসঙ্গের প্রতি আসক্তির (রুচি) দ্বারা সংসারের আসক্তি দূর হয়।

সঙ্গঃ সর্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩৭।২৩)

'সঙ্গ (আসক্তি) সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু যদি ত্যাগ না করা যায় তাহলে সৎপুরুষদের সঙ্গ করা উচিত, কেননা সৎপুরুষদের সঙ্গই সেই সঙ্গ (আসক্তি) দূর করবার ঔষধ।'

প্রশ্ন—আবশ্যকতা এবং কামনার মধ্যে প্রভেদ কোথায় ?

উত্তর—যা অবিনাশী আবশ্যকতা তারই হয় আর কামনা হয় বিনাশশীলের প্রতি। যেমন, রাস্তায় গর্ত থাকলে মোটরগাড়ি তার মধ্যে গড়িয়ে যায়। তাই মাটি, পাথর প্রভৃতি দিয়ে যদি সেই গর্তকে বুজিয়ে দেওয়া যায় তাহলে গাড়ি আর গড়াবে না। তেমনই দেহে ক্ষুধা পেলে তা পূরণ করে দেওয়া হল আবশ্যকতা। ক্ষুধা দূর করতে শাক-পাতাও খেতে পারেন আবার হালুয়া-পুরিও খেতে পারেন, দুটির দ্বারাই পেট ভরবে। কিন্তু অমুক

জিনিস চাই, মিষ্টি চাই, টক চাই, চাটনি চাই—এ হল কামনা। আবশ্যকতার পূর্তি হয় আর কামনার হয় নিবৃত্তি।[১] কামনার পূর্তি কখনো কারো হয়নি, হবে না, হতে পারে না।

প্রশ্ন—কখনো কখনো অন্যকে শেখাবার জন্য সেবা নিতে হয়। এটি কি ঠিক ?

উত্তর—শিশুদের শেখাবার জন্য সেবা নেওয়া হল বাস্তবে সেবা করা। মনে হয় যে এটি নেওয়ার ক্রিয়া। কিন্তু বাস্তবে এটি নেওয়া নয়, প্রত্যুত এটি হল শিক্ষা দেওয়া।

প্রশ্ন—সকলের শরীর তো অনিত্য, তাহলে তাদের সেবা কেন করা হবে ?

উত্তর—অনিত্যের সেবা করলে নিত্যের প্রাপ্তি হয়। তার কারণ অনিত্যের সেবা করলে অনিত্যের প্রতি আসক্তি দূর হয়ে যায় আর আসক্তি চলে গেলে নিত্যকে লাভ করা যায়। বাস্তবে সেবা কেবল অনিত্য শরীরের হয় না। আসলে তা হয় শরীরীর (শরীরধারীর)। আচরণে জড় বস্তু জড়তা (শরীর) পর্যন্ত পৌঁছায়, চৈতন্য পর্যন্ত পৌঁছায় না। কিন্তু যে সেবা নেয় সে নিজেকে শরীর বলে মনে করে। সেজন্য সেই সেবা চৈতন্যের হয়—**'জিমি অবিবেকী পুরুষ সরীরহি'** (শ্রীরামচরিতমানস ১৪২।১)। তাৎপর্য হল, আমরা শরীরকে নিজস্ব বলে মনে করি, তাই শরীর পর্যন্ত পৌঁছায় যে বস্তু তা নিজেদের কাছ পর্যন্তই পৌঁছায়।

ভক্ত তো সবাইকে ভগবানেরই স্বরূপ মনে করে তাদের সেবা করেন—**'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'** (গীতা ১৮।৪৬), **'মৈঁ সেবক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবন্ত'** (শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪)। ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে গেলে তাঁর সংসারে সমতা হয়ে যায়—

তুলসী মমতা রাম সোঁ সমতা সব সংসার।
রাগ ন রোষ ন দোষ দুখ দাস ভএ ভব পার॥ (দোঁহাবলী ৯৪)

সংসারে সমতা হলে আসক্তি চলে যায়। এইটিই হল অনাসক্তি যোগ।

---
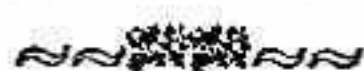
[১]ইংরেজিতে আবশ্যকতাকে Want এবং কামনাকে Desire বলা হয়।